লেখালেখি

লেখালেখি

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়

আজকাল

লেখালেখি
Lekhalekhi
an essay by Bhanu Bandopadhay

প্রথম প্রকাশ
বইমেলা—১৯৯১

দ্বিতীয় মুদ্রণ
বইমেলা ১৯৯৩

তৃতীয় মুদ্রণ
বইমেলা ১৯৯৪

দ্বিতীয় সংস্করণ আশ্বিন ১৪১৫, অক্টোবর২০০৮

© নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায়

ISBN 978-81-7990-072-7

প্রচ্ছদ
দেবব্রত ঘোষ

প্রকাশক
জ্যোতিপ্রকাশ খান
আজকাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
বি পি ৭, সেক্টর-৫, কলকাতা-৭০০ ০৯১

মুদ্রণ
ইউনিক কালার প্রিন্টার
২০-এ পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

ভূমিকা

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছু লেখা ও সাক্ষাৎকার একত্রিত করে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হচ্ছে। বহু আগেই এমন একটা কাজ হলে ভাল হত। তবু কিছু দেরিতে হলেও এটা যে হচ্ছে তা আমার মতো ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসংখ্য গুণমুগ্ধ অনুরাগীর কাছে একটা খুব বড় আনন্দের খবর।

বাংলা ফিল্ম ও বাংলা রঙ্গালয়ে দক্ষ ও প্রতিভাসম্পন্ন অভিনেতা-অভিনেত্রী অনেক হয়েছেন। কিন্তু অভিনয় দেখে ভাল বা মন্দ বলেই নটনটীর নগদ পাওনা মিটিয়ে দেওয়ার রীতি। তাঁদের কাজ নিয়ে ভাবনা-চিন্তা বা তাঁদের সম্বন্ধে সিরিয়াস লেখা নিতান্তই কম হয়। যাও বা লেখা হয় তার মধ্যে গভীর কোনও মূল্যায়ন থাকে না। দেশকালের প্রেক্ষিতে তাঁদের বোঝার চেষ্টা করা হয় না।

সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি নটের অন্যতম হলেও ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। রসপিপাসু সাধারণ মানুষ তাঁকে যত আপনার করেই নিয়ে থাক না কেন তাঁর কাজ নিয়ে চিন্তাশীল সমালোচকরা বড় একটা মাথা ঘামিয়েছেন বলে তো বোধ হয় না। সেই জন্যেই ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা নিয়ে এই বইখানির প্রকাশ একটা আনন্দ সংবাদ। সমালোচক বা ফিল্ম ঐতিহাসিকের লেখা থেকে না পেলেও ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজের লেখা থেকে তাঁর একটা পরিচয় বেরিয়ে আসবে; এই লেখাগুলি প্রয়াত শিল্পীর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে একটা ধারণা গড়ে তোলার সহায়ক হবে বলে আমার বিশ্বাস। সেই সঙ্গে শিল্পীর স্ত্রী নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তাঁর সম্বন্ধে লেখাটিও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও প্রশংসনীয় সংযোজন।

বড় শিল্পী মানুষকে যা দেন মানুষের কাছ থেকেই আদিতে তা তিনি পান। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাজের মধ্যে দেশের মানুষকে, জীবনকে নিবিড়ভাবে ভালবাসার সাক্ষ্য আছে। শুধুমাত্র অভিনয়কর্মেই নয়, সামাজিক রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডেও আজীবন মগ্ন থাকার মধ্যে দিয়ে তাঁর সেই ভালবাসা প্রকাশ পেয়েছিল। এই ভালবাসা এই দেশপ্রেমের উৎসে ছিল দেশমুক্তির বৈপ্লবিক আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর ছেলেবেলার আন্তরিক ও ঘনিষ্ঠ যোগ। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখাগুলির মধ্যে থেকে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিত্বের এই উজ্জ্বল উৎসটির একটা পরিচয় যেমন বেরিয়ে আসে তেমনি বেরিয়ে আসে সচেতন শিল্পীর মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা। 'বর্তমানের অনেক সমস্যা আমাদের সামাজিক অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তোলে। তার প্রতিকার করা হয়ত আমার সাধ্য নয়, তবে সেই সমস্যায় প্রকৃত চেহারা ও সমাধানের ইঙ্গিতবাহী কোনও (কৌতুক) নাটক করতে আমি সব সময়েই আগ্রহী। আবার যদি কোনও 'নতুন ইহুদি' নতুনভাবে করতে হয় তাহলে আমি প্রস্তুত।'

'এখন আমাকে যদি কমিটেড শিল্পী বলা হয়, তাহলে আমার কোনও আপত্তি থাকবার কথা নয়, কেবল একটি ছাড়া। নাটকের মধ্যে দিয়ে আমি মানুষের পক্ষে কথা বলতে চাই সেটা রাজনৈতিক হতেই পারে। তবে আমি কোনও পার্টির রাজনৈতিক বক্তব্য আমার নাটকের মধ্যে বলতে চাই না। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে ও দৃষ্টিভঙ্গিতে যা কিছু সমাজের ও সাধারণ মানুষের স্বার্থের পরিপন্থী আমি দরকার মতো ও সাধ্যমতো তার বিরুদ্ধে মানুষকে খোঁচা দিয়ে জাগানোর জন্যে নাটক করে যেতে চাই তা সে ব্যঙ্গ বা সিরিয়াস যা কিছু হোক না কেন এটাই আমার কমিটমেন্টের শেষ কথা।'

উদ্ধৃত এই পঙ্‌ক্তিগুলির মতো এই বই-এর আরও বহু জায়গাতেই পাঠক মানুষ ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের এমন এক সচেতনতার পরিচয় পাবেন যা আজকের দিনের শিল্পীদের মধ্যে খানিকটা বিরলই হয়ে এসেছে। 'আমাদের সংস্কৃতি কোন পথে' তা নিয়ে মাথা ঘামাতে ক'জন শিল্পীকে দেখতে পাই? সেই সঙ্গে ক'জন শিল্পীর মধ্যে দেখতে পাই পূর্বসূরির প্রতি এমন সকৃতজ্ঞ শ্রদ্ধা, সমসাময়িকের প্রতি এমন দ্বিধাহীন ঈর্ষাশূন্য স্বীকৃতি? মানুষ ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে অভিনয় তথা কৌতুক রসের বিস্তার সম্পর্কেও তাঁর পরিশীলিত মনের চিন্তাও এই লেখাগুলির মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে আছে। অভিনয়কে যাঁরা তাৎক্ষণিক বিনোদনের বস্তুমাত্র বলে মনে করেন না, কৌতুকস্রষ্টা ক্লাউনকে যাঁরা প্রজ্ঞাধিকারী বলে শ্রদ্ধা করেন, সেই সব ভাবুক ও জিজ্ঞাসুর কাছে এই মহান শিল্পীর লেখাগুলি একটা বিরাট প্রাপ্তি। এই প্রাপ্তির জন্যে প্রকাশককে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়
গল্‌ফ গ্রীন, কলিকাতা
১লা জানুয়ারি, ১৯৯১

আমার স্বামী ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়

নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায়

সে তো কবেকার কথা! সব কথা কি আজ আর সঠিক মনে করে বলতে পারব? সালটা খুব সম্ভবত ১৯৪৫-ই হবে। গরমকালের কোনও এক দুপুর দেড়টা দুটো নাগাদ সঙ্গীতগুরু শ্রদ্ধেয় শ্রীসিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের আদেশে তাঁরই সঙ্গে চলেছি শ্রীরামপুর কোর্টের উদ্দেশ্যে। নাঃ কাঠগড়ার আসামি বা ফরিয়াদি হিসেবে নয়। বোধহয় কোনও আইনজ্ঞের বিদায় উপলক্ষে কোর্টের আইনজ্ঞ ও কর্মচারী আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করি সঙ্গীতশিল্পী হিসেবে। পথে অফিসপাড়া থেকে খুব রোগামতো এক ভদ্রলোককে আমাদের গাড়িতে তুলে নিলেন মধুদা। আমরা সিদ্ধেশ্বরবাবুকে ওই বলেই ডাকতাম। মধুদা এবং তিনি সমস্ত পথ এত গল্প করতে করতে গেলেন যে গাড়িতে আমি যে একজন তৃতীয় ব্যক্তি রয়েছি সেটি বোধহয় তাঁরা বেমালুম ভুলেই গিয়েছিলেন। তাছাড়া আমিও তখন এতই লাজুক ও চুপচাপ ছিলাম যে তাঁদের কথার মাঝে যোগদানের তো কোনও প্রশ্নই ওঠে না। আর মধুদাকেও তখন বেশ ভয় পেতাম। সুতরাং ওই অল্প বয়সে রাস্তার মানুষজন, গাড়িঘোড়া, রাস্তাঘাট দেখতে দেখতেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেলাম। ফলে ওই ভদ্রলোক যে কে, কী নাম, কেন যাচ্ছেন — সে সব কিছুই জানতে পারলাম না। আদালত কক্ষে চেয়ার, টেবিল বেঞ্চের ওপরই হারমোনিয়াম নিয়ে আমি এবং মধুদা গান গাইবার পর ওই ভদ্রলোক বেঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে হাস্যকৌতুক পরিবেশন করলেন। তাঁর সেই বিখ্যাত হাসির নকশা ভুল ইংরেজি ও বাংলা মিলিয়ে 'খুনের আসামি মামলা'য় শুনানিতে 'কাস্তে'র definition (সংজ্ঞা) এ 'একদিকে খাঁজ কাটা at the same time another side is মোলায়েম শুনে আদালতকক্ষকে হাসিতে ফেটে পড়তে প্রথম দিনও যেমন দেখেছি, তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্তও ওই নকশা যেখানেই পরিবেশন করেছেন সর্বত্রই ঠিক তেমনি সমানভাবেই হাসির উদ্রেক হতে দেখেছি। তখনকার দিনে মাঠে ময়দানে বা পাড়ায় পাড়ায় এখনকার মতো নিত্যই জলসা হতে আমরা দেখিনি। আমি এর আগে দু-একটা স্কুল-কলেজ বা ধর্মস্থানেই

একটি বিশেষ মুডে ভানু

যা গাইতে গিয়েছি। কিন্তু সে সব স্থানে কৌতুক পরিবেশন কখনও দেখিনি। সুতরাং সেদিক থেকে সেদিন আমার এ অভিজ্ঞতারও প্রথম দিন। ফেরার সময় গাড়িতে মধুদা হঠাৎ আমার কানে কানে বললেন যে 'ওকে বিয়ে করবি?' একথা শোনামাত্রই লজ্জায় সেই যে মাথা নিচু করলাম আর মাথা তুলে বিয়ের আগে পর্যন্ত তাঁর দিকে তাকাতেই পারলাম না। কথা বলা তো দূরের কথা। যদিও তাঁর সঙ্গে আরও দু-একবার দেখা হয়েছে। কিন্তু প্রথম দিনের সেই লজ্জা আমি বিয়ের আগে আর কোনওদিন কাটিয়ে উঠতে পারিনি, অবশ্য তিনিও সে চেষ্টা কখনও করেননি। পরে দু-চারজনের মুখে যখন শুনেছি যে আমাদের দুজনের নাকি প্রেম করে বিয়ে হয়েছে, তখন সত্যিই হাসি পেয়েছে। তাছাড়া ওঁর তখনকার চেহারা যা ছিল তাতে একবার দেখেই প্রেমে পড়ে যাওয়ার মতো নিশ্চয়ই ছিল না। একথা তখনকার যাঁরা ওঁকে দেখেছেন তাঁরা সবাই নিশ্চয়ই মানবেন বলে আমার মনে হয়। আমাদের বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করার পেছনে এরপর পুরো কৃতিত্বটুকুই দাবি করতে পারেন একমাত্র মধুদা। তিনি আমার বাবার কাছে ও শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের মা-বাবার কাছে পাড়েন এবং মধুদার বাড়িতে তাঁরা আমাকে দেখতে আসেন।

১৯৪৬ সালের প্রথম দিকে। সমস্ত দেশ জুড়ে চতুর্দিকে দাঙ্গা-হাঙ্গামার শুরু। অশান্ত আন্দোলনের পরিবেশ। সে সময়ে কলকাতার সমস্ত দোকানপাট (মানে জামা, কাপড়, বিছানা, বাসনই), ট্রাম, বাস, ট্রেন, পোস্টাফিস সমস্ত বন্ধ। এরই মাঝে মধুদার প্রচেষ্টায় ২৩ ফেব্রুয়ারি শ্রীভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমি বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হলাম। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় তখন 'আয়রন অ্যান্ড স্টিল কন্ট্রোল' অফিসে চাকরি করতেন। ছায়াছবির সঙ্গে তখন পর্যন্ত তাঁর কোনও রকম যোগাযোগই ছিল না। বিয়ের চারদিন পর লোকাচার অনুযায়ী দ্বিরাগমন উপলক্ষে (মানে জোড়ে মেয়ের বাপের বাড়ি রাত কাটানো, অনেকে বলেন ধুলোপায়ে) আমার বাপের বাড়ি গেলাম দুজনে। তো সেখানে আমায় নামিয়ে দিয়েই কিছুক্ষণের মধ্যেই আসছি, রাধা ফিল্ম স্টুডিওতে কাজ আছে বলে খুব ব্যস্ত হয়ে চলে গেলেন।

তাঁর জীবনের প্রথম শুটিংয়ের তারিখ সেটাই, 'জাগরণী' ছবিতে। আমি অবশ্য তখন এসব কিছুই জানতাম না। আমার বাবা-মাও বোধহয় এ বিষয়ে আগে কিছুই জানতেন না।

সবার সঙ্গে গল্পগুজবে সমস্ত সন্ধ্যা আমার বেশ জমিয়েই কেটে গেল। আমার বাপের বাড়িতে তখন খুব ঘড়ির কাঁটা ধরে চলা হত। রাত সাড়ে নটার ভেতর বরাবরই বাবাকে রাত্রের খাওয়া সেরে নিতে দেখেছি। আমার ষোলো বছর বয়স পর্যন্ত একদিনের জন্যও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হতে দেখিনি। এদিকে রাত এগারোটা

বেজে যায়, নতুন জামাইয়ের দেখা নেই। সুতরাং সবাই খুব ছটফটাতে লাগলাম। আমার ভাই হারু তখন খুবই ছোট। যদিও আমরা স্টুডিও পাড়াতেই থাকতাম। মানে আমাদের বাড়ির একদিকে 'রাধা ফিল্ম স্টুডিও' (যেখানে এতদিন দূরদর্শন কেন্দ্র ছিল) আর একদিকে ছিল 'ভারতলক্ষ্মী' স্টুডিও (যেখানে এখন 'নবীনা' সিনেমা হল)।

কিন্তু আমরা কোনওদিন সে সব স্টুডিওর গেট পেরতে সাহস পাইনি, আর তখন কারুরই শুটিং দেখার মতো হিড়িক ছিল না এবং সেটাকে কেউ পছন্দও করতেন না। বিশেষ করে আমার যে বাবা সমস্ত জীবনে মাত্র দু-খানার বেশি সিনেমাই দেখেননি, বাড়িতে তখন দ্বিতীয় পুরুষ কেউ না থাকায় বাধ্য হয়ে তাঁকেই বেরতে হল রাধা ফিল্ম স্টুডিওর উদ্দেশে জামাইয়ের খোঁজে। এদিকে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় এ ছবিতে একজন দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত চরিত্রের জন্যই মনোনীত হয়েছিলেন। সুতরাং তাঁর ওই রোগা লিকলিকে চেহারায় খালি গায়ে একখণ্ড ছেঁড়া চট জড়ানো মেক-আপে দেখে এহেন শ্বশুরমশায়ের তো তো ভিরমি খাওয়ার জোগাড়। জামাইয়ের কাছ থেকে শুটিংয়ের দেরি আছে জেনে কোনও রকমে তিনি তো বাড়ি ফিরে এসে গুম হয়ে বসে রইলেন। আমি তো সবার দেরি দেখে খেয়েদেয়ে দিব্যি ঘুমিয়ে পড়লাম। হঠাৎ মাঝরাতে কথাবার্তা শুনে মশারির ভেতর থেকে পিটপিট করে তাকিয়ে দেখি মা বেচারা ক্লান্ত চোখে জামাইকে খুব আদর করে বসে খাওয়াচ্ছেন। তখন বোধহয় রাত দুটো কি আড়াইটে হবে। দেখেই আমি তাড়াতাড়ি আবার চোখ বুজে ফেললাম। নইলে লজ্জার খাতিরে আমাকে আবার ঘুম চোখে উঠে বসে থাকতে হত, সুতরাং অচিরেই আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। প্রথম দিকে যে আমি এ সব দেখেও আবার নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়তে পারলাম সেই আমিই পরে কোনও রকমে বাধ্যবাধকতা না থাকা সত্ত্বেও রাত দুটো, আড়াইটে, তিনটে হলেও কিন্তু দু-চোখের পাতা আর এক করতে পারিনি, ঠায় বসে রয়েছি যতক্ষণ পর্যন্ত না আমার স্বামী বাড়ি ফিরেছেন।

শুনেছি ছোটবেলায় ঢাকা শহরে বিপ্লবী দীনেশ গুপ্তের অনুরক্ত পার্শ্বচর হিসেবে দেশ গড়ার স্বপ্নে বিভোর ছিলেন। কিন্তু ১৯৩৯ সালে ছাব্বিশ বছর বয়সের চাকুরিরত বড় ভাই (মণি)-এর মৃত্যুর কারণে দীনেশদার আদেশে সে পথ ত্যাগ করতে হয়েছে। এরপর হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় সরকারের পরোয়ানায় ঢাকা শহর ছাড়তে বাধ্য হয়ে ১৯৪১ সালে কলকাতায় আসেন। মেজদিদি প্রকৃতি দেবীর (সোনাদিদি) স্বামী শ্রীবাদল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় আয়রন অ্যান্ড স্টিল কন্ট্রোল অফিসে তিন দিন পরেই চাকুরিতে যোগ্য দেন। ১৯৪৬ সালে এই সঙ্গে যুক্ত হলাম আমি।

এইভাবে আমাদের দুজনের সংসার ও শিল্পী জীবনের শুরু। আমরা উভয়ে উভয়ের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গুরুজনদের দেখাশোনার ভার আমার হাতে নিশ্চিন্তে সঁপে দিয়ে স্টুডিও চত্বরে পরিচালক, প্রযোজকদের কাছে ধর্না দিয়ে ঘুরতে লাগলেন। শুনেছি প্রথমদিকে দু-একজন প্রযোজক কি পরিচালক তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছেন এই বলে যে এখনও জিভের আড় ভাঙেনি। কিন্তু পরে তাঁরাই আবার যখন এসেছেন ডেকে কাজ দেওয়ার জন্য তখন শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের পারিশ্রমিকের অঙ্ক শুনে বলেছেন, 'বাবা এত টাকা নেবে?' এর উত্তরে তিনি তাঁদের বলেছেন যে, 'হ্যাঁ, ওই জিভের আড় ভাঙার মূল্য দেবেন না? ওর অর্ধেক হল আমার রেট, আর বাকিটা জিভের আড় ভাঙানোর জন্য।'

ইতিমধ্যে ক্রমে সংসারে দুই ছেলে গৌতম ও পিনাকী এবং পরে মেয়ে বাসবী এল। ততদিনে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় শিল্পী হিসেবে কিছুটা প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছেন। তিনি তখন একাধারে অফিসের চাকরি, সিনেমা এবং যেখানে-সেখানে ক্লাবে থিয়েটার ও বিচিত্রানুষ্ঠানে ইত্যাদি সমানভাবে কাজ করে গেছেন। ১৯৫৪-৫৫ সালে বোম্বাই চিত্রজগতের পরিচালক সত্যেন বোসের পরিচালনায় 'বন্দীশ' ও দুলাল গুহ-র পরিচালনায় 'এক গাঁও কি কহানী' ছবিতে অভিনয় করেন। তখন অনেকেই তাঁকে বেশি পয়সা রোজগারের উদ্দেশে বোম্বাইয়ে থাকবার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন। যদিও তাঁর উক্ত দুটি হিন্দি ছবিতে অভিনয়ের জন্য বেশ সুনাম হয়েছিল, তথাপি তিনি বাংলা চলচ্চিত্র জগৎ ছেড়ে এবং পরিবার থেকে দূরে থাকতে সম্মত হননি। প্রথম জীবনে ১৯৪৮ সালে 'উত্তর সারথী' ও 'ক্রান্তি শিল্পী' সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত হয়ে 'নতুন ইহুদি' নাটক করে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। পরে রঙমহলে 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' করার পর স্টার থিয়েটারে যোগ দেন ও টানা প্রায় ১৫-১৬ বছর সেখানে কাজ করেন। থিয়েটারের কাজ করার জন্য ওই অত বছর আমরা বাইরে কোথাও বেড়াতে যেতে পারতাম না। তাই যখন স্টার ছাড়লেন আমি খুব খুশি হয়েছিলাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের দুজনের একসঙ্গে কোথাও বেড়াতে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। কাজের চাপে। সেজন্য আমার মনে যথেষ্ট ক্ষোভ ছিল। পরে ১৯৭৬ সালে আমরা দুজনে যখন আমেরিকা, কানাডা গেলাম সেখানে বিচিত্রানুষ্ঠানে যোগ দিতে ও ছেলে পিনাকীকে দেখতে তখন আমাকে প্রায়ই বলতেন 'আর কোনও দিন কিন্তু কোথাও বেড়াতে নিইনি একথা বলবে না। সমস্ত জীবনের না বেড়ানোর আপসোস একবারেই পুষিয়ে দিলাম।'

সংসার সম্বন্ধে একেবারেই অনভিজ্ঞ ছিলেন। বাজারহাটের ব্যাপারে কোনও ধারণাই ছিল না। কোন জিনিসের কি দাম হওয়া সম্ভব সে সব কোনও আন্দাজই তাঁর

ছিল না। এ সম্বন্ধে বেশ মজার গল্প আছে।

প্রথম জীবনে আমার শাশুড়ি মাঝে মাঝে ছেলেকে জোর করে বাজারে পাঠাতেন। 'নিজেরা না কিনলে জিনিসপত্র ভাল আসে না' বা 'ইচ্ছেমতো বাজার আসে না' ইত্যাদি বলে বলতেন যে নিজেরা দেখেশুনে বাজার না আনলে কি হয়? কারণ দ্বারভাঙার যোগেশ্বর তখন খুবই ছোট ছিল। কিন্তু তার ওপরেই পুরো বাজারহাটের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় তো সকাল থেকেই বেরিয়ে পড়তেন। সুতরাং মায়ের মেজাজ মাঝে মাঝেই বিগড়ে যেত এবং তার ছেলেকে বাজার যেতেই হত। এদিকে ছেলে তো যোগেশ্বরকে নিয়ে টাকা, থলি সঙ্গে করে বাড়ি থেকে বেরিয়েই যোগেশ্বরের হাতে সমস্ত ধরিয়ে দিয়ে রাস্তা থেকে সরে পড়তেন। আর যোগেশ্বরকে শিখিয়ে রাখতেন কী কী এনেছে বাজার থেকে, কত দাম সে সবের তা যেন শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় সন্ধের সময় বাড়ি ঢোকবার মুখেই যোগেশ্বর তাঁকে জানিয়ে দেয়। এদিকে সেই সেই দিন আমার শাশুড়ি রাত্রিতে ছেলের সঙ্গে খেতে বসে ছেলেকে খুব প্রশংসা করতেন বাজার নিয়ে, আর বলতেন এই তো নিজেরা না গেলে কী হয়! কোনটার কত দাম তা-ও অনেক সময় জিজ্ঞাসা করতেন। এইভাবেই চলছিল বেশ। আমিও কিছু জানতে পারিনি। কিন্তু একদিন সন্ধেবেলা বাড়ি ঢোকবার মুখে যোগেশ্বরের সঙ্গে দেখা না হওয়ায় সেদিন তিনি মায়ের কাছে ধরা পড়ে গেলেন এবং চাপে পড়ে সব স্বীকার করতেও বাধ্য হলেন। তার পর থেকে আমার শাশুড়ি আর কোনওদিনই এই চেষ্টা করেননি। আমিও সে চেষ্টার ধার ধারিনি কোনওদিন।

এইভাবেই আমাদের সংসার চলেছে। আমিও যেমন তাঁর পথে বাধা হয়ে দাঁড়াইনি, তিনিও আমার জগতে বাধাস্বরূপ হননি এবং সংসারে কোনও কাজ করতেন না বলে কোনওদিন সেখানে নাক গলাতেও আসেননি। কিন্তু প্রথম জীবনে রেডিও, রেকর্ডিং বা ছবিতে গানের রিহার্সালে তিনি নিজেই আমাকে নিয়ে গিয়েছেন। জলসায়ও আমি কখনও একা যাইনি। এ বিষয়ে একটা খুব মজার গল্প মনে পড়ছে। ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গে প্রথম গভর্নরের (রাজ্যপাল) পদে অধিষ্ঠিত হলেন মাননীয় রাজা গোপালাচারী। তাঁর সম্মানার্থে তখন সরকারের তরফ থেকে তিনদিনব্যাপী এক বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় রাজভবনে। এর কিছুদিন পূর্বে শ্রীতুলসী লাহিড়ীর লেখা ও শ্রীসুশীল মজুমদার পরিচালিত এবং শ্রীসিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় সুরারোপিত 'সর্বহারা' ছবিটি প্রদর্শিত হয়ে গেছে সিনেমা হলগুলিতে। উক্ত ছায়াছবিটিতে আমি জীবনে প্রথম নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী হিসেবে অংশগ্রহণ করি। শ্রদ্ধেয় রবীন মজুমদার ও আমি নায়ক ও নায়িকার মুখের দ্বৈত সঙ্গীতগুলি গেয়ে

কিছু প্রশংসা অর্জন করি। শ্রীমজুমদার উক্ত ছবির নায়কের চরিত্রেও অভিনয় করেছেন এবং আমার স্বামীও একটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন। সুতরাং ওই তিনদিনের মধ্যে একদিন ওই অনুষ্ঠানে আমি এবং রবিদাও অংশগ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলাম। রাজভবন থেকে আমন্ত্রণ জানাতে এলেন রাজ্যপালের এ ডি কঙ শ্রদ্ধেয় হরিদাস ভট্টাচার্য! (পরে ইনি শ্রীমতী কাননদেবীকে বিবাহ করেন)। মিস্টার ভট্টাচার্য মহাশয় যখন এলেন তখন শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় অফিসে। সুতরাং আমি তাঁকে বললাম আমার স্বামীর সঙ্গে অফিসে যোগাযোগ করতে যাতে তিনি আমার সঙ্গে যেতে পারেন। তখন আমার কোথাও একা যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। আর অনুষ্ঠানটিও ছিল সেদিনই। দুপুরে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে ফোনে জানালেন যাওয়ার পথে তাঁকে তুলে দিতে। মিঃ ভট্টাচার্য তো চলে গেলেন শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিসে যাচ্ছেন বলে। বিকেলে রাজভবন থেকে যিনি আমার কাছে গাড়ি নিয়ে এলেন আমায় তুলতে, দেখলাম, তাঁকে নির্দেশ দেওয়াই আছে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়কে অফিস থেকে তুলে নিতে। আমিও নিশ্চিন্ত হলাম। আমরা রাজভবনে পৌঁছনোর পর শ্রীভট্টাচার্য আমাকে ও রবিদাকে সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন কিন্তু শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কোনও কথাই বললেন না। আমি ভাবলাম যে তিনি সেদিন সেখানে শিল্পী হিসেবে আসেননি তাই হয়ত এরকম করলেন। যদিও তাঁর তখন দু-চারখানা ছবি বাজারে প্রদর্শিত হয়ে গেছে, উক্ত 'সর্বহারা' ছবিরও একজন শিল্পী হিসেবে তাঁর বেশ সুনাম হয়েছে তখন। তাছাড়া দেখি এদিক-ওদিক অনুষ্ঠানে কৌতুকাভিনেতা হিসেবে কিছু পরিচিতি লাভ করছেন তখন সবে। যা হোক আমরা তো সঙ্গীত পরিবেশন করলাম অনুষ্ঠানে। তারপর খাওয়া-দাওয়াও হল। সেদিনের শিল্পী আরও উপস্থিত ছিলেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে যতদূর মনে পড়ে শ্রীমতী উৎপলা সেন, ব্যায়ামবীর বিষ্টু ঘোষ ও তাঁর ছাত্রছাত্রীরা প্রমুখ। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় তো তাঁদের সঙ্গেই গল্পে মেতে রইলেন। ফেরার সময় আমাদের গাড়ি দিতে একটু দেরি হওয়ায় ওয়েটিং রুমে বসে শ্রীভট্টাচার্য আমাদের সঙ্গে মানে বিশেষ করে রবিদার সঙ্গে খুব গল্প করতে লাগলেন। কিন্তু লক্ষ্য করলাম শ্রীভট্টাচার্য একবারের জন্যও আমার স্বামীর দিকে তাকালেনও না, কথাও বললেন না। আমার তো খুব অস্বস্তি হতে লাগল। আর আমিও তখন এত লাজুক ও চুপচাপ ছিলাম যে মুখ ফুটে এ কথা জিজ্ঞাসা করাও আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। মনে মনে ভাবলাম শ্রীভট্টাচার্য যখন এঁর অফিসে গিয়েছিলেন এখানে আমার সঙ্গে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে, তখন তিনি তো নিশ্চয়ই চেনেন। তবুও এরকমভাবে অবজ্ঞা করছেন কেন? যদিও প্রখ্যাত শিল্পীদের সহচরদের উদ্যোক্তারা এর থেকে খুব বেশি সম্মান সর্বদা প্রদর্শন করেন না দেখেছি। তবে আমি তো এরকম

অবস্থায় শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়কে পরে কখনও তো প্রশ্নই ওঠে না যখনকার কথা বলছি তখনও দেখিনি। যাইহোক আমরা আধঘণ্টা গল্পের পর চলে আসবার জন্য গাড়িতে যখন উঠছি তখন শ্রীভট্টাচার্য জিজ্ঞেস করলেন শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখিয়ে যে 'ইনি কে? এঁর সঙ্গে তো আমাকে আলাপ করিয়ে দিলেন না?' আমি তো অবাক। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ই তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন যে 'এ অধম হচ্ছেন আপনার আজকের প্রখ্যাত শিল্পী নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বামী।' শ্রীভট্টাচার্য অত্যন্ত লজ্জা পেয়ে বারবার ক্ষমা চাইতে লাগলেন, এবং আমিও তখনই জানতে পারলাম যে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে উনি ফোনে যোগাযোগ করেছিলেন তাই চিনতে পারেননি। এই ঘটনা নিয়ে পরে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়কে আমি অনেক ঠাট্টা করেছি এই বলে যে 'প্রখ্যাত শিল্পীর অখ্যাত সহচরের দুর্দশা জীবনে একবার হলেও তো উপলব্ধি করতে হয়েছে।' শুনেছি শ্রীভট্টাচার্যও স্টুডিওতে মাঝে মাঝেই তাঁকে এই ঘটনা মনে করিয়ে খুব হাসাহাসি করেছেন।

পরবর্তী যুগে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের জনপ্রিয়তার কথা আমি আর কী বলব! আপনারা সবাই জানেন। কোথাও গেলে জনসাধারণের ছুঁড়ে দেওয়া 'পাশের বাড়ির' 'খ্যাংড়া কাঠির ওপর আলুর দম', 'বসু পরিবারের' 'এ পাল সে পাল নয়, সাক্ষাৎ পালবংশ' সাড়ে চুয়াত্তর ছবির 'মাসিমা মালপোয়া খামু' সংলাপের বানে এবং জনসাধারণের উচ্ছ্বাসের আধিক্যে অনেক সময়ই অসুবিধে বোধ করেছি। শখ করে কোথাও বেড়াতে যাওয়ার উপায় ছিল না। আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের উৎসব বাড়িতে আমাকে একাই অংশগ্রহণ করতে হত। আমৃত্যু তাঁকে এই জনপ্রিয়তার শিখরেই দেখেছি। একবার কি একটা ছবির শুটিংয়ে মনে নেই উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া দেবী প্রমুখ আরও অনেকের সঙ্গে দিল্লি গিয়েছিলেন। যে হোটেলে ছিলেন চতুর্দিকে তো ভিড়, মহানায়ককে দেখবার জন্য। একসময় হোটেলের 'কিচেন' থেকে খুব গুঞ্জন। উঁকিঝুঁকির ভিড় ঠেলাঠেলি শোনা গেল। এরই মাঝে হোটেল ম্যানেজারকে এগিয়ে আসতে দেখে শিল্পীদের মধ্যে একজন বলে উঠলেন 'ওরা নিশ্চয়ই উত্তমকে দেখার জন্য অমন করছে?' ম্যানেজারমশাই বললেন, 'না! ওরা ভানুবাবুর সঙ্গে একটু কথা বলতে চায়। ভানুবাবু আপনি দয়া করে একটু কিচেনে আসবেন?' বলে তাঁকে নিয়ে গেলেন। আর একবার প্রফেসর সত্যেন বোসের কাছে কিছু লোক গিয়েছিলেন তাঁকে যাত্রা সম্মিলনীর সভাপতিত্ব করার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে। প্রফেসর বোস তাঁদের জানান 'আমি তো বৈজ্ঞানিক, আমাকে কেন এতে যেতে বলছ। তোমরা আমার ছাত্র ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়কে নাও।' এ কথায় উদ্যোক্তারা কী অসুবিধার কথা জানালে প্রফেসর বোস যেতে অসম্মতি জানিয়ে তাদের রসগোল্লা খাইয়ে বিদায়

দেওয়ার সময় বললেন, 'আমার কাছে শুধু গোল্লা পেলে, ভানুর কাছে যাও রসটা পাবে।' প্রফেসর বোস মাঝেমাঝেই ফোন করে বলতেন, 'ওরে ভানু আমার মাথাটা যে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল, শিগগির আয় একটু রস ঢেলে মাথাটা ছাড়িয়ে দিয়ে যা।'

তাঁর প্রত্যুৎপন্নমতিত্বও ছিল অসাধারণ। আমার স্বামী কোনও কথা রেখেঢেকে বলতে চাইতেন না। মনে যা আসত তা অপ্রিয় সত্য হলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তা বলেই ফেলতেন। শুনেছি একদিন শুটিংয়ের ফাঁকে এক অভিনেত্রীর সঙ্গে বসে গল্প করছেন। তাঁরা স্বামী-স্ত্রী উভয়েই অভিনয় করেন। তা অভিনেত্রীটি বলছেন যে 'বাবা তোমার দাদা এবেলা যদি একটা আইটেম খান তো ওবেলা অন্য নতুন আইটেম দিতেই হবে, নইলে উনি খাবেনই না।' শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'সে কি রোজ সব নতুন নতুন আইটেম চাই? না হলে চলবে না?' তা মহিলা বলছেন, 'না, ভাই উনি হাতই দেবেন না নইলে।' শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে বলে উঠলেন, 'ও! একমাত্র আপনিই বুঝি রইয়া গেলেন?' বুঝুন তখন অভিনেত্রীটির অবস্থা।

প্রথম জীবনে ২৮ বুকের ছাতি নিয়েও সাহসের কমতি দেখিনি। শুনেছি একদিন রাসবিহারীর মোড়ে 'অমৃতায়নে'র আড্ডাস্থলে তখনকার দিনের ওই তল্লাটের ত্রাসস্বরূপ 'নেলো' নামের একজন তাঁর কয়েকজন সাকরেদসহ এসে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখিয়ে দোকানের একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ ছোকরা কে রে? এই ছোকরা তোর নাম কী?' এর উত্তরে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে উল্টে প্রশ্ন করলেন, 'তুই কে?' দোকানের উপস্থিত সবাই তো চমকে উঠেছে ওঁর সাহস দেখে। প্রশ্ন শুনে ভদ্রলোক বুক বাজিয়ে সদর্পে বলে উঠলেন, 'আমি কালীঘাটের নেলো'। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় তৎক্ষণাৎ উত্তর করলেন 'আমি ঢাকার ভুলো'। এবং এ কথা বলেই নাকি তিনি রেস্টুরেন্টের কয়লা ভাঙার হাতুড়িটি হাতে তুলে নিয়েছিলেন। সাহস দেখে এই নেলোদাই তাঁর খুব ভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন এবং পরে অনেকের মুখেই আমি এ গল্প শুনেছি।

একবার রাম চ্যাটার্জির (চন্দননগরের) কয়েকজন সাকরেদ এসে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়কে বললেন, 'অমুক দিন রামদার ফাংশান আছে, সময়মতো পৌঁছে যাবেন।' এ কথা শুনে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় তো অবাক। তার মানে? আমার কোনও কাজ আছে কিনা জিজ্ঞেস করলেন না আমি পারব কিনা যেতে বা কী দেবেন কিছুই বললেন না, যাবেন মানে? কে আপনাদের রামদা যে বললেই যেতে হবে?' সেই ছেলেরা তো অবাক হয়ে বলে, 'সে কী মশাই! কে রামদা আবার জিজ্ঞেস করছেন। রাম চ্যাটার্জির নাম শুনলে সব যে বাপ বাপ বলে দৌড়য়। আর আপনি যাবেন না মানে, সে যে তুলে নিয়ে যাবে।' শুনে আমার স্বামী বললেন, 'নিয়া যাইতে পারে

উল্টোরথের ফাংশনে: ১৯৫৪

তবে আমার লাশ নিতে লাগব। জ্যান্ত অবস্থায় তো আমারে নিতে পারব না। কও গিয়া তোমাগো বাপেরে!' এহেন কথা শুনে সেই ছেলেরা তো রাম চ্যাটার্জিকে গিয়ে সব কথা জানাল। তিনি শুনেই বলেছেন, 'সর্বনাশ এ তোমরা কী করেছ? বাঙালের পো-কে খেপিয়ে এসেছ, একবার যখন সে বলেছে আসবে না, তখন আর সে কিছুতেই আসবে না।' কয়েক দিনের ভেতরই শ্রীচ্যাটার্জি সদলবলে আমাদের বাড়ি। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে ক্ষমা চেয়ে তাঁকে বললেন, 'ভাই কিছু মনে কর না, এ ছেলেদের তুমি ক্ষমা করে দাও।' তারপর অনুরোধ জানালেন অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্য। বললেন, 'নইলে আমার প্রেস্টিজ থাকবে না ভাই এদের কাছে, তোমার যখন সময় হয় একবার এসে দাঁড়িও।' এভাবে বলাতে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ও রাজি হয়ে গেলেন। গল্পগুজব করার পর শ্রীচ্যাটার্জি যাওয়ার আগে বললেন, 'তুমি যে যেতে আগে রাজি হওনি। আমি কিন্তু তোমায় তুলেই নিয়ে যেতে পারতাম।' শুনে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, 'পাগল, এত খাবলা খাবলা নাকি? আমারে পাইতা কই, আমি একছুটে গিয়া ছাদে উঠতাম।' শুনে হেসে রামবাবু বললেন, 'তা হলেই কি রেহাই পেতে ভেবেছ?' তিনি বললেন, 'পাইতাম, তোমার মাথায় তো আর মাস্‌ল নাই, উপর থিকা একখান আধলা ইট ঝাড়তাম তোমার মাথায়, তখন যাইতা কই?' একথা শুনে রামবাবু হাসতে হাসতে আর একবার অনুরোধ জানিয়ে চলে গেলেন। এই রামবাবুকেই আমি পরবর্তী-জীবনে দেখেছি অনন্ত সিং যখন অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে ছিলেন, তখন তাঁকে একদিন তিনিও দেখতে গেছেন, আমরা দুই স্বামী-স্ত্রীও গিয়েছি। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখামাত্রই রামবাবু অনন্তদাকে বলেছিলেন, 'জানেন তো অনন্তদা ওকে আমি ভীষণ ভয় পাই, ও আমার থেকে বেশি সাহসী।' যখন শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় বোম্বাইয়ে 'বন্দীশ' ছবির শুটিংয়ে গিয়েছিলেন তখন একদিন স্টুডিওতে বোম্বাই চিত্রজগতের শিল্পী 'হীরালালের' সঙ্গে পরিচালক সত্যেন বোস আলাপ করতে গিয়ে বললেন, 'হীরালাল এঁকে চেন? ইনি কলকাতার আর্টিস্ট ভানুবাবু।' শুনে হীরালাল বলেছিলেন, 'বাপরে, আবার ভানুবাবু? ইয়ে তো ডাকু হ্যায়, ডাকু।' বলে জড়িয়ে ধরেছিলেন। কারণ ১৯৪৫-৪৬ সালে এই হীরালাল, সুন্দর ও এস পাল মহিন্দর সবই কলকাতায় আমরা যে অঞ্চলে থাকি সেখানে থাকতেন, কোনও একটি করণে সেই সময় শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় হীরালালকে প্রচণ্ড মেরেছিলেন। সেই কথাটাই স্মরণ করেই তিনি ওরকম কথা বলেছিলেন।

তাঁর চরিত্রের আর এক বৈশিষ্ট্য ছিল তিনি কোনওদিন কোনও অন্যায়ের সঙ্গে কখনও আপস করেননি। চিরকাল তার প্রতিবাদে মুখর হয়েছেন। তাতে তাঁর ক্ষতি হলেও তিনি অন্যায় মেনে নেননি। এই মনোভাবের বশেই ১৯৬৮-৬৯-এ বোধহয়

চিত্রজগতে যখন প্রোডিউসারের সঙ্গে টেকনিসিয়ানদের আন্দোলন শুরু হয়, তখন সেই আন্দোলনে টেকনিসিয়ানদের পক্ষ নিয়ে অভিনেতৃ সঙ্ঘের পক্ষ থেকে নেতৃত্বের পুরোভাগে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ প্রতিবাদ জানিয়ে যান। এবং তখনই অভিনেতৃ সঙ্ঘ থেকে কিছু শিল্পী আলাদা হয়ে গিয়ে শিল্পী সংসদ এবং সংরক্ষণ সমিতির জন্ম হয়। সেই সময় উত্তমকুমারও অভিনেতৃ সঙ্ঘ থেকে বেরিয়ে আসেন। প্রযোজক মহল তখন তাদের বিরুদ্ধাচরণ করে যারা টেকনিসিয়ানদের পক্ষ নিয়েছিল সেই সব শিল্পীকে তাদের ছবির কাজ দিতে অস্বীকার করে। এর কিছুদিনের মধ্যেই সত্যজিৎ রায়ের 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' বইটির রিলিজ নিয়ে সংরক্ষণ সমিতি বাধা দেয়। তখনও শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত লাহিড়ী, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ রুখে দাঁড়িয়ে নিজেরা উপস্থিত থেকে ওই বই রিলিজ হতে সাহায্য করেন। কিছুদিন আগে থেকেই শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় থাইরয়েডের অসুখে ভুগছিলেন। এই সময়ে তিনি নানানভাবে মানসিক চাপে প্রথম হার্টের অসুখে আক্রান্ত হলেন। শ্রীসৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ই প্রথম ডাক্তার দেখিয়ে তাঁর সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। ধীরে ধীরে অন্য শিল্পীরা প্রযোজকদের সঙ্গে খানিকটা আপসে গেলেন, শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু কিছুতেই মাথা নত করেননি। সুতরাং চলচ্চিত্র জগতে তিনি পাঁচ বছর Black Listed হয়েছিলেন। কিন্তু অন্যায়ের সঙ্গে আপস তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ হওয়ায় তিনি মাথা নত করেননি। অনেক সুবিধা হওয়া সত্ত্বেও কারুর কাছে কাজ চাইতে যাননি। চতুর্দিকে জলসা, রেকর্ড ইত্যাদি করেই কোনওরকমে চলছিলেন। তারপর তিনি 'সুশীল নাট্য সংস্থায়' অতিথি শিল্পী হিসেবে যাত্রা শুরু করেন। এর আগে ১৯৫৬ সালে চলচ্চিত্র জগতে পাকাপাকিভাবে কাজ করার জন্য 'আয়রন অ্যান্ড স্টিল কন্ট্রোলের' চাকরিটি ছেড়ে দিয়েছিলেন। এবার ফিল্ম জগৎও বন্ধ হল। কিন্তু তবুও একদিনের জন্য তিনি ভেঙে পড়েননি বা তাঁর মতাদর্শের পরিবর্তন ঘটেনি। একাই সংগ্রাম করে গেছেন। ধীরে ধীরে তিনি ১৯৭০ সালে সুশীল নাট্য সংস্থা কিনে নিয়ে 'সুশীল নাট্য কোম্পানি' প্রতিষ্ঠা করলেন। এ ব্যাপারে সর্বাগ্রে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছিলেন শ্রীরমণলাল মহাশয় এবং ইউকো ব্যাঙ্ক ম্যানেজার শ্রীনরেন ভট্টাচার্য। তিনি পুরোদমে যাত্রা করে ঘুরতে লাগলেন। ক্রমে তিনি ১৯৭৪ সালে আরও একটি যাত্রাদল গঠন করলেন। 'মুক্তমঞ্চ' নামে। এরপর একটার পর একটা সফল পালাগানের রেকর্ড। একই আসরে পরপর তিনটি শো-ই হাউসফুল হয়ে যাত্রাজগতে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে 'মুক্তমঞ্চ' যাত্রাপার্টি। মাঠেঘাটে ঘুরে ঘুরে কি অমানুষিক পরিশ্রম করেছেন এই সংসারের হাল ধরে রাখতে এবং চলচ্চিত্র জগৎকে উপহাসভরে দেখাতে ভাবা যায় না। তাঁর মনের দৃঢ়তা দেখে অনেককেই শ্রদ্ধা

সহকারে নোয়াতে দেখেছি। যাঁরা প্রথমদিকে উনি যাত্রায় যোগ দেওয়ার মুখ বেঁকিয়ে হেসেছিলেন অবজ্ঞাভরে, সেই শিল্পীর অনেকেই কিন্তু পরে যাত্রায় গিয়েছেন। যে মানুষ নরম বিছানা ছাড়া শুতে পারতেন না, তিনি মাঠেঘাটে ময়দানে শতরঞ্চি পেতে গাছের তলায়ও শুয়ে থেকেছেন। যিনি বাড়ি থাকলে বেলা ১২টা-১টার মধ্যে মাথায় জল ঢালামাত্রই না খেয়ে এবং খাওয়ামাত্রই না ঘুমিয়ে পারতেন না। বাড়িতে যতই অতিথি থাকুক তাঁর এ নিয়মের ব্যতিক্রম হতে পারত না। আগডুম বাগডুম জিনিস খাওয়া যিনি পছন্দ করতেন না, সেই মানুষ দিনের পর দিন ফুলুরি সহকারে মুড়ি কিংবা, শুধু জিলিপি খেয়ে কাটিয়ে দিয়েছেন দিনের পর দিন। শুনেছি কোথায় একটি পুরনো স্কুলবাড়িতে যাত্রার উদ্যোক্তারা তাঁকে শুতে দিয়েছেন দুপুরে। ঘুমের মধ্যেই হঠাৎ ঘরের সিলিং ঝরঝরিয়ে খসে তাঁর বুকের ওপর পড়েছে। তবু তিনি হাসিমুখে এ সব সহ্য করেছেন। কিন্তু চলচ্চিত্র জগতে আসবার জন্য মাথা নোয়াননি। আমরাও তাঁর এই দৃঢ় মনোভাব দেখে বারণ করতে সাহস পাইনি।

শ্রদ্ধেয় ছবি বিশ্বাস (অভিনেতা) তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তাঁকে ডাকতেন আদর করে 'ভেনো' বলে। কখনও বলতেন 'বাঙালটা'। দিনে একটিবার দেখা না হলে ছটফটিয়ে হয় বাড়ি চলে আসতেন নয় ফোন করতেন। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ও ছবিদাকে বড় ভাইয়ের মতো শ্রদ্ধা করতেন। আমার শ্বশুর মারা যেতে ছবিদা জোর করে তাঁর পকেটে ৫০০ টাকা গুঁজে বলেন, 'রেখে দে কাজে লাগবে', এবং শ্রাদ্ধের দিন তিনি একফোঁটা জল গ্রহণ না করলেও (তিনি সেরকম শর্তই করিয়ে নিয়েছিলেন) আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের আতিথেয়তায় শেষ পর্যন্ত উপস্থিত থেকেছেন। এই ছবিদা যেদিন জাগুলিয়া যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় মারা গেলেন, সেদিন গাড়ি নিয়ে এসে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়কে অনেক অনুরোধ করেছিলেন সঙ্গে যাওয়ার জন্য, কিন্তু কাজ থাকায় তিনি যেতে পারেননি। এতে তাঁর ভীষণ অনুশোচনা ছিল এবং ছবিদার মৃত্যুতে তিনি সত্যিকারের একজন শুভাকাঙ্ক্ষী হারানোর যন্ত্রণা অনুভব করে ভেঙে পড়েছিলেন।

চিত্রজগতের অনেককেই তিনি আমাদের না জানিয়ে সাহায্য করেছেন। অনেকেই ছবি করিয়ে টাকা দেননি। আমার মনে পড়ে এক পরিচালকের শুটিং চলাকালে কোনও টাকা কোনও দিন না পেলেও শেষ শুটিংয়ের দিন তাঁর পকেটে কিছু টাকা গুঁজে দিয়ে বলে এসেছেন, 'আমার বাড়ি গিয়ে এই টাকা নীলিমাকে দিয়ে আসবি।' এবং সেই পরিচালক শ্রীঅজিত লাহিড়ী যখন আমার বাড়ি এসেছেন তখন তিনি চিৎকার করে আমায় ডেকে বলেছেন, 'নীলিমা দেখ, ও এসেছে আমায় টাকা দিতে' এবং তাঁর মুখের হাসি ও আনন্দ দেখে আমি মোটেই বুঝতে পারিনি তখন এ সব।

কিন্তু তিনি মারা যাওয়ার পর সেই পরিচালকই এসে আমার কাছে এই গল্প শুনিয়ে গেছেন।

আর একবার কী বইতে টাকা না পেলেও শুটিং শেষ হয়ে ছবি রিলিজ হওয়ার ২/৩ বছর বাদে সেই ছবির প্রযোজক ধীরেশ চক্রবর্তী একদিন তাঁর পাওনা টাকা যেদিন দিতে এলেন, সেদিন একতলা থেকে বাড়ি কাঁপিয়ে চিৎকার করে আমায় ডাকতে লাগলেন। 'নীলিমা শিগগির এসে দেখে যাও কী অভিনব কাণ্ড। এই ছেলেটি আমার বকেয়া টাকা দিতে এসেছে। এ কোনও দিন শুনেছ? তবে যে তুমি বল কোনও মানুষ সৎ নয়? দেখ দেখ চেয়ে দেখ' বলে তাকে জড়িয়ে ধরলে চোখ দিয়ে টস টস করে জল ঝরতে লাগল আনন্দে এবং শ্রীচক্রবর্তীকে আশীর্বাদ করতে লাগলেন। অথচ এ টাকা যে পাওনা ছিল আমি কিন্তু আগে তা জানতাম না। বিপ্লবী অনন্ত সিং যখন ছবি করেন তখন তাঁর থেকে টাকা নেওয়া তো দূরের কথা উল্টে কিছু দিয়েছেন শুনেছি। পর পর ৪/৫ খানা ছবি করে টাকাও নেননি তিনি। অথচ এই 'যমালয়ে জীবন্ত মানুষ' ছবি করে প্রযোজকের ঘরে বেশ মোটা টাকা এসেছিল। যেহেতু তিনি বিপ্লবী তাই তাঁর কাছে টাকা চাইতে পারেননি। এ সব আমি তখন জানতেই পারিনি। অনেক পরে জানতে পেরে আমি অনন্তদার কাছ থেকে সামান্য কিছু চেয়ে নিয়েছিলাম। তবে তা এত সামান্য যে একখানা ছবিরও পারিশ্রমিক নয়। এ ছাড়া উপায়ও ছিল না। কারণ অনন্তদার হাতও খালি শুনেছি।

স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। সর্বশ্রী রাধাবল্লভ গোপ, রমেশচন্দ্র আচার্য, মাখন পাল, ননী ভট্টাচার্য, প্রণব মুখার্জি, বিশ্বনাথ মুখার্জি, গীতা মুখার্জি, বঙ্গেশ্বর রায়, গণেশ ঘোষ প্রমুখের সঙ্গে যেমন হৃদ্যতা দেখেছি, তেমনই আবার জগন্নাথ কোলে, সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, শ্রীমতী মায়া রায়, প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সি, সুব্রত মুখার্জির সঙ্গেও কম হৃদ্যতা দেখিনি। শ্রদ্ধেয়া মায়া রায় তো আমার ছোট ছেলে পিনাকীর প্রথম আমেরিকা যাত্রাকালে অফিসিয়াল কিছু অসুবিধা (রওনা হওয়ার দু-দিন আগে) দেখা দেওয়ায় দশ মিনিটের মধ্যেই তা মিটিয়ে দিয়ে আমেরিকা যাওয়ার পথ সুগম করে দিয়েছিলেন। আজ তাই আমার সেই ছেলে সেখানে এনভায়রনমেন্টালে ডক্টরেট করে চাকরি করার সুযোগ পেয়েছে। ইচ্ছে ছিল সে দেশে ফিরলে পিনাকীকে নিয়ে তিনি শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী রায়ের সঙ্গে দেখা করবেন। কিন্তু ৯ বছর পর ছেলে যখন দেশে ফিরে এল আমাদের সঙ্গে দেখা করতে, তখন সে রকম কোনও অসুস্থতা না থাকলেও ১০-১৫ দিনের মাথায়ই তিনি ইহলোক ত্যাগ করে গেলেন।

বসুশ্রী সিনেমা হলে দিনান্তে একবার ঢুঁ না মারলে 'ভাত হজম হয় না' আমরা

বলতাম। হল মালিক শ্রীমন্টু বোসকে তিনি ছোট ভাইয়ের মতো স্নেহ করতেন, অত্যন্ত ভালবাসতেন। প্রয়োজনে তাকে শাসনও করতেন। শ্রীবোসের বাবা, কাকারাও শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়কে খুব ভালবাসতেন ও বিশ্বাস করতেন। মাঠেঘাটে যাত্রা করে ঘুরে ঘুরে যখন খুব শরীর ভাঙতে থাকল, তখন আমি একটু জোর করতে লাগলাম যাত্রা থেকে অবসর নেওয়ার জন্য। সুযোগও এসে গেল আমার হাতে। এই সময়ে 'রঙ্গনা' থিয়েটারের তখনকার প্রযোজক শ্রীহরিদাস সান্যাল মহাশয় এলেন তাঁর থিয়েটারে যোগ দেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে। তখন তিনি (শ্রীসান্যাল) বলেছিলেন, তাঁর অনেক ধার দেনা হয়ে গেছে তাই তাকে উদ্ধার করতে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় যেন সাহায্য করেন। কারণ, শ্রীসান্যালের তখনকার প্রদর্শিত নাটকগুলিতে তিনি প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় যদিও দোনামোনা করছিলেন যাত্রা ছাড়তে কিন্তু আমি আড়াল থেকে শ্রীসান্যালকে আশ্বাস দিয়ে এবং আমার স্বামীকে জোর করে তখন পেশাদারি মঞ্চ রঙ্গনায় যোগ দিতে বাধ্য করি। কারণ আমি মনে করেছিলাম তখন তিনি বাইরে বাইরে ঘুরলে অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়বেন তাই কলকাতায় বাড়িতে থেকে এখানে কাজ করলে আমার যত্নে থাকবেন। ১৯৮০ সালে এইভাবে তাঁর যাত্রাদলের দু-একজনকে নিয়ে এবং ওই স্ক্রিপ্টেই 'জয় মাকালী বোর্ডিং' নাটক নিয়ে 'রঙ্গনা' থিয়েটারে যোগ দিয়ে দু-বছর নাগাড়ে শো করে গেছেন। তাঁরই ইচ্ছায় যাত্রার স্ক্রিপ্ট একইরকম রাখা সত্ত্বেও শ্রদ্ধেয় দেবনারায়ণ গুপ্তকে উপদেষ্টারূপে রাখা হয়েছিল। যদিও প্রযোজকের মতে খুব আপত্তি ছিল। তবে একমাত্র শেষ দৃশ্যে নায়ক ও নায়িকার রোমান্টিক সংলাপ ও চায়ের ঘটনা শ্রীগুপ্ত জুড়ে দিয়েছিলেন। রঙ্গনাতে এই বই যতদিন চলেছিল প্রত্যেকদিন 'হাউসফুল' হয়েছে। পরে শ্রীসান্যাল জানিয়েছিলেন দু-বছরের ভেতর তার অত বিপুল ধার শোধ হয়েও অনেক টাকা লাভ হয়েছিল। এরই মাঝে ২ বছরের মাথায় তিনি সামান্য অসুস্থ বোধ করায় ছুটি নিতে বাধ্য হলেন কিছুদিনের জন্য এবং ২ মাসের মাথায় প্রযোজক ও শ্রীগুপ্ত তাঁর অমতেই অন্য নাটক শুরু করে দিলেন এবং শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় শরীর খারাপ নিয়েই আবার সংগ্রামে মেতে উঠলেন। এবার তিনি রঙমহলে শ্রীসুধাংশু মিত্রের প্রযোজনায় রঙ্গনার শিল্পীদের মধ্যে কয়েকজনকে নিয়ে আবার নতুন করে 'জয় মাকালী বোর্ডিং' শুরু করে দিলেন। এবং এবারও প্রতি শো হাউসফুল হতে লাগল। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আবার তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এবার আমি জোর করে তাঁকে এক মাসের বিশ্রাম নিতে বাধ্য করলাম। এবং এক মাসের মাথায়ই তিনি পরলোকগমন করেন। যাত্রাজগতের যাঁদের নিয়ে তিনি 'রঙ্গনায়' যোগ দিয়ে তাদের প্রথম রঙ্গমঞ্চে অবতরণের সুযোগ করে দিয়েছিলেন তাঁদের বেশিরভাগই নাকি বুঝেছিলেন তিনি আর বেশিদিন কাজ

চাটুজ্যে ও বাঁড়ুজ্যে: ১৯৫৫

করতে পারবেন না। তাই তাঁরা 'রঙ্গনা' ছেড়ে 'রঙমহলে' তাঁর সঙ্গে এসে সহযোগিতা করেননি। আমি কিন্তু এ কথা বুঝিনি তখনও। যাঁর বিরোধিতায় 'পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সম্মেলনের' প্রতিযোগিতায় পুরস্কারে বঞ্চিত হয়েছিলেন, তাঁকেই শেষ পর্যন্ত সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করে এসেছেন। তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্যই ছিল এই। চিরকাল অন্যায়ের শিকার হয়েও তিনি আদর্শচ্যুত হননি। আমি যতটা পেরেছি, বরাবরই তাঁকে সহযোগিতা করতে চেষ্টা করেছি। নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে ছবির নেপথ্য সঙ্গীতের টেকিংয়ের একটা ঘটনা বলি। আগের দিন আমি স্টুডিওতে রিহার্সাল দিয়ে এসে খুব ঝগড়া করলাম তাঁর সঙ্গে এই বলে যে, নিজের বইতে আমায় কেন এরকম গান দিলেন। সুতরাং পরদিন আমি কখনও রেকর্ডিংয়ে যাব না, তিনি যেন অন্য শিল্পীকে দিয়ে ওই গান গাওয়ান বলে তো রাত্রে শুয়ে পড়লাম। ঘুম থেকে উঠে জানলাম আমার বাড়িতে বিরাট চুরি হয়ে গেছে। আমার হাতের চারগাছা চুড়ি ছাড়া কোথাও আর সোনার টুকরোও নেই (প্রায় ৭০ ভরি সোনা চুরি গেছে)। সকালবেলা থেকে পুলিস থানা করে তো শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় হয়রান হয়ে যাচ্ছেন আর মনের অবস্থা তো বুঝতেই পারছেন। কিন্তু ওইদিন বেলা বারোটায় আমি আর একবর্ণও উচ্চারণ না করে তাঁর সঙ্গে গিয়ে ওই গান রেকর্ড করে এলাম। আমার মনে হল আমার এখন মনের যা অবস্থা সেরকম তো ওনারও। সুতরাং এই অবস্থায় এখন আবার কাকে ঠিক করতে যাবেন। এই মনোভাবেই যাত্রার সুরকার ও গীতিকার নিয়ে খুব চিন্তিত দেখে তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলাম, 'অত চিন্তার কিছু নেই। দেখি আমি পারি কিনা।' বলে পরপর ৮/৯ খানা বইয়ের গীতিকার ও সুরকারের ভূমিকা পালন করি। যদিও প্রথম দিকে তিনি আমার নামই প্রকাশ করেননি। তিনিও আমার সঙ্গীতচর্চায় কোনওদিন বাধাস্বরূপ হননি। তাঁরই উৎসাহে বাড়িতে অমন সঙ্গীতের পরিবেশ না থাকা সত্ত্বেও আমি বরাবর সঙ্গীতচর্চার সুযোগ পেয়েছি। এইভাবেই আমরা দুজনে দুজনের সহায়ক স্বরূপ ছিলাম। তিনি যদিও গান গাইতে পারতেন না একেবারেই, তবুও তাঁর সামনে আগে তাঁর শোনা কোনও গানের একটু সুর ভুল করলে উনি ধরতে পারতেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত মনে করে ঠিক সুর না করতে পারতাম, ততক্ষণে ছাড়তেন না।

উনি নিজে সারাদিন বাইরে থাকলেও বাড়ি ফিরে সবাইকে না উপস্থিত দেখলে ভীষণ অসন্তুষ্ট হতেন। বাড়ি ফিরে দোরগোড়া থেকে যোগেশ্বরের কাছে সেদিনের খাওয়ার মেনু জিজ্ঞেস করে নিতেন। এবং তাঁর পছন্দমতো না হলে খাওয়ার উৎসাহই দেখতাম না। এ জন্য অনেক সময় আমি অসন্তুষ্টও হয়েছি। আগে জেনে নিয়েছেন বলে। সামান্য লাউ খোসা ভাজা, মোচার তরকারি, মাছের মাথার মুড়িঘণ্ট

চাল দিয়ে, তেল কৈ ইত্যাদি কিছু থাকলে ভীষণ খুশি হতেন। অনেক সময় যোগেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করতেন শুধু লাউখোসা বাজারে কিনতে পাওয়া যায় কিনা। যার ওপর চটতেন তাকে অত্যন্ত গালাগালি করার পর যাঁর মুখ আর দেখার কথা নয়, তিনিই বিপদে পড়ে সামনে এসে দাঁড়ালে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন সাহায্য করতে বা অসুস্থ হয়ে পড়লে সর্বাগ্রে তাঁর খবর নিতে ছুটতেন। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বন্ধুভাবে মিশতেন কিন্তু তাই বলে কখনও কোনওরকম ইয়ার্কি ফাজলামি করার সুযোগ তাদের দেননি। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের কারও প্রতি শ্রদ্ধা, ভালবাসা বা স্নেহ বা কোনও অনুভূতির মধ্যেই কোনওরকম ফাঁকি ছিল না। তাঁর মনে এক মুখে আর এক কখনই দেখিনি। তিনি যা বলতে বা করতে চাইতেন তার বহিঃপ্রকাশ ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট। আবার যার অন্যায় আচরণে চটতেন তাকে তার মুখের সামনেই গালাগালি করতেও ছাড়তেন না। তিনি যত বড়ই নামী হন না কেন। এতে নিজের বিরাট ক্ষতির সম্ভাবনা থাকলেও পিছু হটতেন না। তবে কারুর আড়ালে তার নিন্দা করাও ভীষণ অপছন্দ করতেন তিনি, যত খারাপ লোকই হোন না কেন!

তাঁর ভালবাসা, স্নেহ বা শ্রদ্ধার আতিশয্যে (উগ্র আন্তিরকতায়) সেই ব্যক্তি বিরক্তি বোধ করছেন কিনা সে খেয়াল তাঁর থাকত না। তবে সে ব্যক্তি দ্বারা কোনও কারণে আঘাত পেলে ভীষণ অভিমানী হয়ে পড়তেন এবং মনে মনে অত্যন্ত মুষড়ে পড়তেন। যদিও শিল্পীদের দ্বারা কোনও আঘাতের কথাই তিনি বাড়িতে বলতে চাইতেন না। কিন্তু তাঁর সহধর্মিণী হিসেবে পাশাপাশি থাকবার সুযোগ অনেকটাই উপলব্ধি করতে পারতাম অনেক সময়েই। ১৯৬৮-৬৯ সালে চলচ্চিত্র শিল্পে যখন ব্যাপক আন্দোলন শুরু হল তখনকার একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। চলচ্চিত্র জগতে অভিনয়ের শুরুর দিকে প্রখ্যাত শিল্পী উত্তমকুমারের সঙ্গে তাঁর অত্যন্ত হৃদ্যতা ছিল। উত্তমকে তিনি ছোটভাইয়ের মতো স্নেহ করতেন ও ভালবাসতেন। তার সমস্তরকম আপদে-বিপদে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় সর্বাগ্রে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তেন এবং সৎ পরামর্শ দিয়ে পাশে দাঁড়াতেন। উত্তমও বড় ভাইয়ের মতো তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন এবং সর্বদাই ছুটে আসতেন সৎ পরামর্শ নিতে। কাজে বেরোবার পথে আমার স্বামী প্রায় বেশিরভাগ দিনই উত্তমের খোঁজ নেওয়া যেন আবশ্যকই মনে করতেন। তাদের পরিবারের অনেক সমস্যার সমাধানেই তাঁর সদিচ্ছার প্রকাশ বিশেষভাবে দেখা গেছে। যদিও কেউই কারুর প্রফেশনে নাক গলাতেন না। এভাবেই চলছিল প্রথম থেকে। উক্ত আন্দোলনে অভিনেতৃ সঙ্ঘের ব্যানারে টেকনিসিয়ানদের পক্ষ নিয়ে উত্তম সর্বদাই শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে পাশে থেকে আন্দোলন চালিয়ে গেছেন। কিন্তু আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে হঠাৎ রাতারাতি সেই উত্তমই যখন শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের নীতি থেকে

সরে গিয়ে 'শিল্পী সংসদ' ও 'সংরক্ষণ' সমিতির সঙ্গে হাত মেলালেন, আমার স্বামীর তখনকার সেই মানসিক যন্ত্রণার কথা ভোলবার নয়। যদিও তিনি ওই বিষয়ে আমার কাছে একটি বাক্যও উচ্চারণ করেননি বা আমি যতদূর জানি উত্তমকেও তিনি একবার জিজ্ঞাসাও করেননি এ ব্যাপারে। মাঝরাতে উঠে রাতের পর রাত অস্থিরভাবে তাঁকে পায়চারি করতে দেখেছি যা শত বিপদেও জীবনের শেষদিন পর্যন্তও তাঁকে আর কখনও অমন অস্থির হতে দেখিনি। তাঁর সেই অস্থিরতা দেখেও আমি সাহস পাইনি তাঁকে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করতে বা সান্ত্বনা জানাতে। তাঁর সেই মর্মবেদনা আমি কাছে থেকে যতটা উপলব্ধি করেছি আর কারও পক্ষেই তা সম্ভব নয়।

এ কারণে তখন চলচ্চিত্র শিল্পে জড়িত প্রযোজক মহল তাঁকে Black Listed করেন। পরবর্তী পাঁচ বছর কোনও প্রযোজক বা পরিচালক তাঁদের ছবিতে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়কে কাজ দেননি। কিন্তু দৃঢ় মনের শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় অনেক কষ্ট সহ্য করা সত্ত্বেও মাথা নত করে কারও কাছে একদিনের জন্যও কাজ চাইতে যাননি। উপরন্তু চ্যালেঞ্জের মনোভাব নিয়ে যাত্রাশিল্পে যুক্ত হয়ে কিছুদিনের ভেতরই 'সুশীল নাট্য কোং' ও 'মুক্ত মঞ্চ' নামে দুটি যাত্রা কোম্পানির মালিক হন। ১৯৬৯ থেকে '৭৮ সাল পর্যন্ত এই যাত্রা কোম্পানির ব্যানারে পরপর 'গোপাল ভাঁড়', 'বৈকুণ্ঠের উইল', 'যমালয়ে জীবন্ত মানুষ', 'ভৈরব মন্ত্র', শ্রীরমাপতি বোসের 'শ্রীযুক্ত আলিবাবা' প্রভৃতি পালা নিয়ে যথেষ্ট সুনামের সঙ্গে রাতের পর রাত জেগে দেশের একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ঘুরে ঘুরে কি অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারা ওই অন্যায় অবিচারের মোকাবিলা করেছিলেন, আশা করি ইন্ডাস্ট্রির কেউ তা এরই মধ্যে ভুলে যাননি? এভাবে অত্যধিক পরিশ্রমে শরীর ভেঙে পড়ায় অবশেষে শেষ পর্যন্ত যাত্রায় প্রদর্শিত সর্বাধিক সার্থক পালা শৈলেশ দে-র লেখা 'জয় মা কালী বোর্ডিং'-এর হুবহু যাত্রাস্ক্রিপ্টকে নাটকাকারে শুধু সিন ভাগ করে নিয়ে ১৯৭৮ সালে রঙ্গনা থিয়েটারে যোগ দিলেন। তারপরের ঘটনা তো সকলের জানা। অভিনেতৃ সঙ্ঘের নির্বাচনের সময় জনৈক শিল্পীকে সবার আপত্তি সত্ত্বেও জেতাবার জন্য অসম্ভব দৌড়াদৌড়ি করেছিলেন। মৃত্যুর মাত্র ২-১ মাস পূর্বে এক শিল্পীর অসুস্থতায় নিজের চিকিৎসকের নিষেধ অমান্য করে ও আমাকে লুকিয়ে প্রত্যেকদিন চারতলা সিঁড়ি ভেঙে উঠে দু'বেলা তাঁর খবর নিতে যেতেন। এতে তাঁর শরীরের যথেষ্ট ক্ষতি হবে জেনেও। সেই শিল্পীই পরে অভিনেতৃ সঙ্ঘ প্রযোজিত ছবি 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' চলচ্চিত্রায়িত করবার সময় প্রতি পদে তাঁর অমতে চলে তাঁকে কত ব্যথা দিয়েছেন। তাঁর মনের অবস্থার কথা উপলব্ধি করতে চেষ্টাই করেননি, যদিও ছায়াছবিটি করার পেছনে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের অপরিসীম

উদ্যোগ বা অবদান ছিল, তা জানা থাকা সত্ত্বেও। এতে যে তিনি কত ব্যথা পেতেন তা সর্বদা ভ্রুক্ষেপই করতেন না। ওঁর মৃত্যুর পর ওই শিল্পীর দরবারে উক্ত ছবিতে 'খাটান অর্থ' আমাকে এখন কিছু কিছু করে ফিরিয়ে দিলে আমার অত্যন্ত উপকার হয়— এ অনুরোধ বহুবার জানানো সত্ত্বেও তা ফিরিয়ে দেওয়া তো দূরের কথা, একবারের জন্য যোগাযোগ করা বা বছরে একটি দিনের জন্যও তাঁকে স্মরণ করে সৌজন্য প্রকাশও আবশ্যক মনে করেন না।

আমার স্বামীকে 'তুমি কেন সবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়, তোমার কথা তো কেউ চিন্তা করে না!' ইত্যাদি বললে তিনি উত্তর করতেন যে, 'আমি এরকমই করব, আমার স্বভাবই এই। আমার এই রক্তে আর অন্যরকম হওয়া সম্ভব নয়, এখন যদি আমার সমস্ত রক্ত বার করে নিয়ে নতুন রক্ত আমার দেহে ইনজেক্ট করে ভরে দিতে পার, তবে যদি অন্যরকম হয়, নইলে আর নয়।'

সামান্য আঘাতে অভিমানী এই ব্যক্তিটিই কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে একেবারে উল্টোপথ অবলম্বন করতেন। শুনেছি ১৯৪১ সালে ঢাকা থেকে কলকাতায় এসে সোনাদিদি (টুকুন বা প্রকৃতি)-র বাড়ি বেশ কিছুদিন ছিলেন। ভগ্নীপতি শ্রী বাদল গঙ্গোপাধ্যায় অত্যন্ত রাশভারী মেজাজি মানুষ ছিলেন। তাঁর ভয়ে বাড়ির সবাই সর্বদা থর থর। তাঁর কথার কখনও নড়চড় হওয়ার উপায় ছিল না। বাড়ির নিয়ম ছিল সময়মতো সবাইকে খাওয়ার টেবিলে উপস্থিত থাকতেই হবে। একদিন রবিবার দুপুরে তো ভানুবাবু আড্ডাটাড্ডা দিয়ে অনেক দেরি করে বাড়ি ফিরে দেখেন সমস্ত বাড়ি যেন থমথম করছে। সবাই গম্ভীর চুপচাপ। সবাই খেয়েছেন কিনা জানতে চাইলে কেউ কোনও উত্তর দিল না। খাবার চাইতে এসে দেখলেন রান্নাঘরের শেকল তুলে দেওয়া হয়েছে। ব্যাপার কি জানতে বালচান্দ ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করায় জানতে পারলেন যে তিনি দেরি করে ফেরায় বাবুর হুকুম হয়েছে কেউ আজ আর খেতে পাবে না। তিনি নিজেও খাবেন না এবং তাঁর হুকুমেই রান্নাঘরে শিকল তুলে দেওয়া হয়েছে। বেগতিক দেখে ভানুবাবু বালচান্দের কাছে খাবার চেয়ে নিয়ে রান্নাঘরে বসেই চুপিচুপি খেয়ে কারও সঙ্গে কোনও কথা না বলে আবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় এরকম দেখে হতাশ হয়ে বললেন, 'তবে আর আমার রাগ করে না খেয়ে থেকে লাভ কি? যার জন্য করলাম সে তো দিব্যি খেয়েদেয়ে আবার আড্ডা দিতে চলে গেল!' অগত্যা এহেন ভগ্নীপতিকে সন্তানতুল্য শ্যালকের কাছে বাধ্য হয়ে হার মানতে হয়েছে। পরবর্তীকালে তিনি আর শ্যালকের কাছে এভাবে রাগ প্রকাশ করার মতো মূর্খামি কখনই দেখাননি।

আমার বেলায়ও এরকম অনেকেই হয়েছে। কোথাও হয়ত দু'জনে বেড়াতে যাওয়ার কথা। আমি তো সেজেগুজে তৈরি হয়ে আছি। সময় চলে যায়, তাঁর কিন্তু দেখা নেই। রাগ হয়ে অনেক সময় কথা বলিনি বা খাইনি। তিনি কিন্তু বাড়ি এসে একবারও ওই বিষয়ে কোনও কথাই তুলতেন না। বা জিজ্ঞাসাও করতেন না কেন খাচ্ছি না বা কথা বলছি না, বা রাগ করেছি কিনা। পাত্তাই দিতেন না। নিজের মতো খাওয়া-দাওয়া করেছেন, বেরিয়েছেন। তাঁর হাবভাব দেখে মনে হত তিনি বোধহয় বুঝতেই পারেননি আমি যে রাগ করেছি। বুঝুন! ডেকে বলা যায় নাকি যে 'আমি কিন্তু রাগ করেছি।' তখন তাঁর হাবভাব দেখে মনে হত আমি কথা না বলায় তিনি যেন বেঁচেছেন, কারণ ইচ্ছেমতো যখন তখন বেরিয়ে যেতেন কোনও বাধা থাকত না বলে। অভিমান করে সেই জায়গায় আমি আর বহুদিন পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে যাব না বলে স্থির করে রেখেছি। তাঁর হাবভাব দেখে যখন মনে হয়েছে, দূর শুধু শুধু অভিমান করে রয়েছি। ইনি নিশ্চয়ই বেড়াতে যাওয়ার কথাটা একদম ভুলেই গিয়েছিলেন, এই ভেবে মনে মনে যখন নরম হচ্ছি সেই সময়ে কোনও একদিন হয়ত বছরখানেক বাদেই নিজেই সেখানে যাওয়ার কথা বলেই বলতেন, 'ওঃ তুমি তো আবার আমার সঙ্গে সেখানে যাবে না।' কিংবা ছেলেমেয়েরা হয়ত সেখানে যাওয়ার কথা তুলেছে। আমি তো অভিমানে হ্যাঁ বা না কিছুই বলছি না। উনি তখন তাড়াতাড়ি আমার পিঠ চাপড়িয়ে বলে উঠতেন, 'নাঃ নাঃ রাগটা রাখ। রাগটা রাখ। রাগ মেইনটেইন করা ভাল। এই তোরা মায়'রে ডিসটার্ব করিস না, রাগটা মেইনটেইন করতে দে।' বলে খুব তাড়াতাড়ি হয় খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়তেন নয় নিজে তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়তেন, বোধহয় পাছে আমি আবার মত পাল্টে ফেলি এই ভয়ে। পাশের বাড়ি, বসু পরিবার, টনসিল, সাড়ে চুয়াত্তর, ওরা থাকে ওধারে, যমালয়ে জীবন্ত মানুষ, ভ্রান্তিবিলাস, টাকা আনা পাই, পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে, কাঞ্চনমূল্য, ছেলে কার, ৮০-তে আসিও না, বন্দীশ (হিন্দি), চাটুজ্জে-বাড়ুজ্জে প্রভৃতি একটার পর একটা ছবি হিট করলেও বা সুনামের শিখরে ওঠা সত্ত্বেও কিন্তু তাঁর ভাগ্যে কোনও রকম রাষ্ট্রীয় পুরস্কার কিংবা বিদেশের পুরস্কার জোটেনি। এই বিষয়ে নিয়ে শ্রদ্ধেয় ছবি বিশ্বাস তাঁকে খুব খেপাতেন প্রায়ই। আমার মেয়ে বাসবী যখন 'অতিথি' ছবির জন্য রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেল, তখন ছবিদা ওকে শিখিয়ে দিতেন 'যা বাবাকে বলে আয়, আমি তো একটা ছবি করেই রাষ্ট্রীয় পুরস্কার লাভ করলাম, তুমি তো এত ছবি করেও এখন পর্যন্ত একটাও পুরস্কার আদায় করতে পারনি।' শুনে তিনি মুচকি মুচকি হাসতেন আর বলতেন, এ নিশ্চয়ই ছবিদার কাজ। অনেক সময় তিনি দুঃখ করে বলতেন, আমার সব চেয়ে বড় অপরাধ আমি এদেশের

সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, ভানু ও মঞ্জু দে 'সাবধান' : ১৯৫৬

অসমাপ্ত ছবি (১৯৫৬) : নৃপতি, ভানু, জহর গাঙ্গুলি ও পাহাড়ী সান্যাল

মাটিতে জন্মেছি, নইলে বিদেশের মাটিতে জন্মালে আমি এতদিনে 'স্যার' উপাধি পেতাম।

সেই দুর্ভাগ্যের হাত থেকে যে এখনও মুক্তি পাওয়া গেছে তা আমি মনে করি না। কারণ আজও দূরদর্শনে প্রদর্শিত তাঁর যথেষ্ট হিট ছবিগুলির নাম প্রচারের সময় শিল্পী তালিকায় শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম অনেক সময়ই অনুক্ত থাকে। আজ পর্যন্তও তাঁর স্মরণে দূরদর্শনে কোনও রকম অনুষ্ঠান হতে দেখলাম না। যদিও শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় অভিনীত অনেক নাটক, যাত্রা বা দূরদর্শনের জন্মদিন উপলক্ষে কৌতুকাভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছেন। এবং সেই ক্যাসেট থাকার কথা। উপরন্তু তাঁর জীবিতকালের অত্যন্ত গুণমুগ্ধ টিভি-র কর্মচারী ভক্তদের কথাটা পাড়লে উত্তর পাওয়া যায়, 'উনি তো আর India fame নন?' তাঁর স্মৃতিরক্ষার্থে শিল্পী জগতে বা কোনও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে কোনও রূপ উদ্যোগ নিতে আজও দেখা যায়নি। দীর্ঘ ৩৫-৪০ বছর এইচ এম ভি গ্রামোফোন কোম্পানি থেকে একটার পর একটা রেকর্ড হিট হয়ে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করে গেছেন। কিন্তু আজ সাত- আট বছরে প্রচুর রয়্যালটি পাওনা হওয়া সত্ত্বেও আজও তা থেকে বঞ্চিত। আমার ছেলে গৌতম এই ক'বছর অনেক হাঁটাহাঁটি করে উক্ত কোম্পানির এক উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সহায়তায় সম্প্রতি ওই অর্থের অতি সামান্যতম অংশ আদায়ে সমর্থ হয়েছে। বাকি অর্থ আর পাওয়া যাবে কিনা তা তাঁরাই বলতে পারেন। ইদানীং শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের কমিকের ক্যাসেট প্রকাশের খবর তো আমায় কাগজ দেখেই জানতে হয়। সুতরাং এ ব্যাপারে অর্থের নিয়মকানুন সম্বন্ধে তো কোনও কিছুই আমার জানা নেই। অবশ্য আমি জীবিত অবস্থায়ই আমার গানের ক্যাসেট বাজারে বেরলে যেখানে আমাকে তা খবরের কাগজ মারফতই জানতে হয় সেখানে প্রয়াত শিল্পীর প্রতি এ সম্মান আশা করাই ভুল।

মারা যাওয়ার মাত্র একমাস আগে অসুস্থ অবস্থায় শয্যাগত থাকাকালীন একদিন দক্ষিণারঞ্জন বসু বাড়ি এসে মাত্র সেই বছরের জন্য 'সুশীল নাট্য কোম্পানি' লিজ নেওয়ার আর্জি জানালে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় টাকা-পয়সা সম্বন্ধে কোনও কথা না বলে শুধু মৌখিক সম্মতি জানিয়ে বলেন, 'ঠিক আছে, সুস্থ হয়ে উঠে এ সম্বন্ধে পরে পাকা কথা বলব।' একথা শুনে দক্ষিণারঞ্জন জোর করে খুব সামান্য অর্থ দিয়ে পরে আসবেন বলে স্বীকৃতিস্বরূপ লিখিয়ে নিয়ে চলে যান। মৃত্যুর ২ মাসের মধ্যে ওই যাত্রা কোম্পানি যৎসামান্য অর্থে তাঁর কাছে বিক্রি করবার জন্য আমায় পীড়াপীড়ি করতে থাকেন আমি তখনই বিক্রয় সম্বন্ধে কোনও কথা বলতে না চাওয়ায় একটি পয়সাও না দিয়ে ওটি আত্মসাৎ করেন। এসব দেখে যখন মানুষের প্রতি বিতৃষ্ণা,

অবিশ্বাস জন্মায় তখন আর একদিকে শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সমিত ভঞ্জ, রুমা গুহঠাকুরতা, প্রতিমা দাশগুপ্তা, স্বপন পাঠক বা সুকুদা, ছবিদি প্রমুখকে দেখলে মানুষের প্রতি বিশ্বাস জাগে।

আবার এ-ও দেখেছি মৃত্যুর মাত্র কিছুদিন পূর্বে শ্রদ্ধেয় উৎপল দত্ত ও শ্রীমতী শোভা সেন একদিন বাড়ি এসে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে উৎসর্গ করা শ্রীদত্তের লেখা 'গিরীশ-মানস' গ্রন্থটি যখন তাঁর হাতে সঁপে দিয়ে গেলেন আনন্দে অভিভূত হয়ে তাঁর চোখে জল দেখেছি। শ্রীদত্তের দেওয়া সম্মান তাঁর কাছে রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের চেয়েও বেশি মনে হয়েছিল এবং তিনি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ বোধ করেছিলেন এর জন্য। তেমনি যাত্রা করতে গিয়ে ফেরবার পথে প্রদর্শনীস্থান থেকে পাঁচ-সাত মাইল দূরে এক অশীতিপর বৃদ্ধা যখন মালা হাতে দৌড়ে এসে বুকে জড়িয়ে বলেছেন, 'বৈকুণ্ঠের উইলের জ্যান্ত গোকুলকে দেখবার জন্য পথে দাঁড়িয়ে আছি। বেঁচে থাক বাবা।' তিনি বলতেন এর চেয়ে বড় পুরস্কার আর আমার কাছে কী আছে বল?

শিল্পী শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় একাধারে শিল্পী ও ডাক্তার। তাই তাঁকে নিয়ে সবার কাছে খুব গর্ব করে বলতেন যে 'ওর ভাত মারে কে? আর্টিস্ট মহলে সুবিধা না হইলেও ওর ভারী বইয়াই গেল। ও ডাক্তারি করব। ওর ল'গে বেশি কেরিমেরি কইরো না।' আর শুভেন্দুকে সর্বদা উপদেশ দিতেন 'তুই ডাক্তারিটা শুরু কর, একটা চেম্বার খুইলা বয়, উপকারে লাগব। দেখবি পরে দাদার এই উপদেশ কাজে লাগব।' প্রায়ই এরকম বলতেন। অবশেষে শুভেন্দু চেম্বার খোলবার মনস্থ করে জানানোতে বলেছিলেন, 'তোর চেম্বারের উদ্বোধন কোনও মন্ত্রী বা নেতাকে দিয়ে হইব না, আমি এর উদ্বোধন করব।' শুভেন্দু দিন স্থির করে ব্যবস্থাপনায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। নির্দিষ্ট দিনের কিছুদিন আগেই শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় ইহলোক ত্যাগ করেন। কিন্তু শুভেন্দু সে কথা স্মরণে রেখে চোখের জল ফেলতে ফেলতে ডোভার লেনের সেই চেম্বার আমার বড় ছেলে গৌতমকে দিয়ে উদ্বোধন করান। তাঁর সেই সৌজন্যে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ। এইভাবে একাধারে বুবু (সমিত ভঞ্জ), সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, রুমা গুহঠাকুরতা, প্রতিমা দাশগুপ্তা, হরিদাস সান্যাল, স্বপন পাঠক প্রমুখ শিল্প জগতের ব্যক্তি অপরদিকে আর এ পি-র রাধাবল্লভ গোপ, প্রণব মুখার্জি, দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, কংগ্রেসের প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সি, সুব্রত মুখার্জি প্রমুখ তাঁর একটু অসুস্থতার খবরে উদ্বিগ্ন হয়ে ছুটে আসতেন খবরাখবর নিতে। তাঁদের সেই আন্তরিকতার ছোঁয়ায় অনেক না পাওয়ার দুঃখ মুছে গিয়ে তাঁর মুখে কৃতজ্ঞতা ও তৃপ্তির হাসি দেখে আমরাও তৃপ্ত হয়েছি।

সম্প্রতি জানতে পারলাম আমেরিকায় আমার তিন বছরের নাতি ইন্দ্রনীল নাকি যে কাজটি তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে বা যে খাবারটি খাওয়ায় তার আপত্তি সেটাই বলে:

'কালকে কব্বো' বা 'কালকে খাব'। শুনে আমার বেশ অবাক লাগছে এই ভেবে যে ওর দাদুকেও দেখেছি তাঁর মা যখন কোনও কাজের কথা বা কোথাও যাওয়ার কথা বলতেন তিনি সেটা পারবেন কি না পারবেন, কিংবা করার হয়ত ইচ্ছেই নেই তবুও তখুনিই উত্তর দিতেন। 'কাউলকাই করুম'। তারপর বারবার মনে করিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও যখন ওই একই উত্তর করে মাস কাটিয়ে দিতেন, অথচ কাজটা হত না, তখন আমার শাশুড়ি চটে গিয়ে বলতেন 'আরে! কালকে কালকে করে তো মাস কাটিয়ে দিলি, এবার 'না' কর। একটু 'না' বলতে শেখ।' এরকমই 'ভ্রান্তি' ছবির কাহিনীকার সুকু সেন ও ছবিদি আমাদের বাড়ি বেড়াতে এসে যখনই বলতেন 'আমাদের বাড়ি কবে আসছেন বলুন ভানুবাবু?' তিনি তন্মুহূর্তেই একটুও না চিন্তা করেই উত্তর করতেন 'কাউলকাই যামু।' কিন্তু সেই কাল আসতে অনেক সময় ছ'মাস কি বছরও ঘুরে গেছে। এ নিয়ে এখনও আমাকে যেতে বলেই ওরা সেকথা মনে করে হাসাহাসি করে বলেন, 'আবার কাউলকেই যামু বলবেন না যেন।' তাই আমার অবাক লাগে যে নাতি তার দাদুকে দেখা তো দূরের কথা তার মা-ই যেখানে শ্বশুরকে দেখেনি সেখানে দাদুর স্বভাবটি এরই মধ্যে তার ভেতর কী করে বর্তে গেল! আজ দাদু থাকলে একথা জানলে কতই না তৃপ্তি পেতেন হয়ত। তেমনি 'রঙ্গনা' হলে 'জয় মাকালী বোর্ডিং' নাটকের দ্বিশততম (বোধহয়) রজনীর অনুষ্ঠানে বাসবীর দু-আড়াই বছরের ছেলে সঞ্জু (কুণাল ঘটক) উইংসের পাশে দাঁড়িয়ে নাটক চলাকালীন তাঁর দাদুর সংলাপের পুনরাবৃত্তি করে সোচ্চারে 'মাকালীর বাচ্চা' বলে চেঁচিয়ে উঠে যে দাদু দুনিয়ার লোককে হাসিয়েছেন তাঁকেই মঞ্চের ওপর হাসিয়ে পরবর্তী সংলাপ ভুলিয়ে ছেড়েছে। সেদিন বাড়ি ফিরে তিনি বলেছিলেন 'যাক সঞ্জুই আমার উত্তরসূরি হবে, আমি নিশ্চিন্ত হলাম' বলে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন।

এইভাবে আমার জীবন কেটে গেছে। তাঁকে না জিজ্ঞেস করে কোনও দিন কিছু করিনি। যদিও তিনি তার কোনও মতই জোর করে খাটাতে চাননি। তবুও আমি জিজ্ঞাসা না করে পারিনি। আজ তাই প্রতিপদে আমাকে তার অভাব বেদনা দেয়। যে বাড়ির প্রতিমুহূর্ত ছিল পূর্ণ প্রাণোচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ আজ তাই নিষ্প্রাণ নিস্তব্ধ। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় সর্বদাই বলতেন, 'তোমরা আমায় কাজ ছেড়ে দিয়ে বিশ্রাম নিতে বল না। নাম পড়ে গিয়ে বা অসুস্থ হয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে বেঁচে থাকার চাইতে মরে যাওয়াই ভাল। সেদিন আমার যেন কখনও না আসে। কাজ করতেই যেন আমার মৃত্যু হয়। ভগবানের কাছে আমার এই প্রার্থনা।' হ্যাঁ, অনেক দুঃখের মাঝেও আজ আমার এইটুকু সান্ত্বনা যে তাঁর মনোবাঞ্ছা মতো কাজ করতে করতে সুনামের শিখরে থেকেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেছেন।

ইডেনে বাংলা-বম্বে তারকাদের বিচিত্রানুষ্ঠানে ভানু ও নীলিমা : ১৯৫৬

সংযোজন

আমার স্বামী ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় হারিয়ে গেছেন প্রায় ২৫ বছর পূর্ণ হতে চলল। স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে টুকরো টুকরো কত কথাই তো মনে পড়ে সর্বদাই, কিন্তু বয়সের ভারেই বোধহয় এখন আর সে সব ঠিকমতো গুছিয়ে লিখতে পারি না।

শুনেছি ছোটবেলায় ৭/৮ বছর বয়সে ওঁদের দেশে গ্রামের বাড়ি পাঁচগাঁওয়ের কোনও অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিতদের ভারী জগের জল পরিবেশন করতে গিয়ে কারও পাতে জল পড়ে যায়। যাঁর পাতে জল পড়ে তিনি ছিলেন ভীষণ রাগী মানুষ। বাড়িসুদ্ধু লোক তাঁকে ভয় পেত। তিনি ছিলেন আমার শ্বশুরমশাইয়ের কাকা। রেগে গিয়ে তিনি ভানুবাবুকে ভীষণ চেঁচিয়ে একটা খুব খারাপ গালি দিয়ে বকে ওঠেন। শুনে ছোট্ট নাতি ভানুও জলের জগটি মাটিতে বসিয়ে হাত দুটি মুঠি করে ততোধিক জোরে চেঁচিয়ে তাঁর গালিটিই তাঁকে ফিরিয়ে দেন। এবং দেখা যায় তাঁর দু'চোখ দিয়ে অঝোর ধারায় জল পড়ছে এবং রাগে থরথর করে সমস্ত দেহ কাঁপছে। এ হেন পরিস্থিতিতে সবাই ভয়ে যখন সিঁটিয়ে গেছে কী হয় কী হয় ভেবে তখন দেখা গেল ওই রাগী বৃদ্ধ দাদু দৌড়ে এসে ছোট্ট নাতিকে জড়িয়ে বুকে তুলে আনন্দে চেঁচাতে লাগলেন এই বলে যে এতদিনে এমন একজনকে পেলাম যে এই পরিবারের নাম বজায় রাখবে। ভানুর বয়স যখন ১০/১২ বছর সেই সময়ে তাঁর বাবা জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মানে আমার শ্বশুরমহাশয় ঢাকার নবাবের স্টেটে আমমোক্তার হিসেবে এবং মাতা শ্রীমতী সুনীতা দেবী ব্রিটিশ সরকারের এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে 'জেনানা গভর্নেস' হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ওই সময় ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিপ্লবী দল লুকিয়ে-চুরিয়ে একত্রিত হয়ে মিটিং ইত্যাদি করে পরামর্শ করবার জন্য প্রায়ই মিলিত হত। যেহেতু বাবা, মা সরকারি কর্মী ছিলেন তাই ছেলেমেয়েদের ওপর আদেশ ছিল যে এমন কোনও কাজ করবে না যা সরকারের বিরুদ্ধে যায়।

১২ বছরের ভানু একদিন এরকম একটি মিটিং সেরে বাড়ি ফেরামাত্র বাবা তাঁকে বকাঝকা করার পর বললেন, তোকে বারণ করেছি না, ওই সব মিটিংয়ে কখনও যাবি না। (কারণ এ খবর তাঁরা কারও মারফত আগেই পেয়ে গিয়েছিলেন) ছেলে কোনও

উত্তর না দিয়ে ঘর পেরিয়ে দোতলার সিঁড়ি বেয়ে ৪/৫ ধাপ উঠে উত্তর দেয়—'এসব মিটিংয়ে যদি কেউ নাই যাবে— তবে অমন মিটিং হয়ই বা কেন?

ম্যাট্রিক পাস করার পর তিনি ঢাকায় জগন্নাথ কলেজে ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে আই এ পাস করার পর ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে বি এ পড়তেন। এই চালক-চতুর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ছাত্রটিকে কলেজের প্রায় সব প্রফেসরই স্নেহ করতেন। কলেজ জীবনে তিনি যে-সব নামীদামি প্রফেসরদের স্নেহধন্য ছিলেন— তাঁরা হলেন যেমন কবি জসীমুদ্দিন সাহেব, কবি মোহিতলাল মজুমদার, প্রফেসর শহীদুল্লা সাহেব, প্রফেসর পদ্ম রুদ্র, আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বোসের মতো সব দিকপাল জ্ঞানী-গুণী।

ইউনিভার্সিটির যে কোনও অনুষ্ঠানে নাটক, জলসা ইত্যাদিতে অভিনয় বা কবিতা পাঠ ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করতেন। বন্ধু ইন্দু সাহা ও ভানু দুজনে কবি জসীমুদ্দিন সাহেব বা মোহিতলাল মজুমদারের কবিতা ঢাকা রেডিওতে পাঠ করেছেন। এছাড়া তখন তো এখনকার মতো পাড়ায় পাড়ায় বা যখন-তখন সব জায়গায় জলসা হত না। শ্রী ইন্দু সাহা ঢাকা রেডিওতে এবং পরে কলকাতা রেডিওতেও অ্যানাওন্সার হিসেবে কাজ করেছেন। ভানুবাবুর খুব অহঙ্কার ছিল ওই রকম সব প্রফেসর মহল তাঁর প্রশংসা করতেন বলে। অনেক সময় ওই ছাত্রটি নিজের ক্লাসে অনুপস্থিত থাকতেন বলে একদিন শ্রদ্ধেয় জসীমুদ্দিন সাহেব রেগে গিয়ে ছাত্র ভানুকে যখন সাবধানবাণী শোনান যে 'এভাবে চললে তোমাকে কিন্তু ফাইনাল পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হবে না', শুনে ছাত্র মুচকি হেসে বলে, 'আমিও তাহলে আর আপনের কবিতা পাঠ করুম না।' শুনে প্রফেসর সাহেব একটু হেসে সরে যান। শুনেছি নিজের ক্লাস কেটে ভানু গিয়ে আচার্য সত্যেন বোসের বাংলা ক্লাসে গিয়ে মুগ্ধ হয়ে বসে থাকতেন। সেই সময় আচার্য সত্যেন বোস বিজ্ঞান ছাড়া বাংলাও পড়াতেন। প্রফেসর বোসও তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন।

প্রফেসর শহীদুল্লা সাহেবের চেহারা ছিল বেঁটে, খাটো, মোটা মতো এবং ঘাড় পর্যন্ত ঝাঁকড়া চুল। হনহন করে হাঁটবার সময় ওই বড় চুলগুলি ফুলে ফুলে দুলে দুলে উঠত। কলেজের দুষ্ট ছাত্রটি প্রায়ই পেছন থেকে আওয়াজ দিয়ে বলে উঠত 'টাট্টুঘোড়া'। একদিন ওই প্রফেসর ঘুরে দাঁড়িয়ে ছাত্র ভানুকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ব্যাপার বলত, ভানু? আমায় দেখলেই 'টাট্টুঘোড়া' বলে আওয়াজ দাও কেন বলত?' ছাত্র ঘাবড়ে গিয়ে একটু হেসে আমতা আমতা করে বলেই ফেলেন, 'স্যার, আপনে যখন তাড়াতাড়ি কইরা হাইট্টা যান, তখন আপনের ঝাঁকড়া চুল গুলান এমনভাবে ফুইল্যা ফুইল্যা ওঠে না, য্যান মনে হয় টাট্টু ঘোড়ায় ঠিক য্যান কেশর দুলাইয়া চলতাছে।' প্রফেসর শহীদুল্লা সাহেব ছাত্রের সত্যি কথা বলার সাহস

দেখে একটু মুচকি হেসে চলে যান।

শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের মাঝবয়সেও একইরকমভাবে বলা একটি ঘটনা আমার মনে পড়ছে। খুব সম্ভবত 'পুষ্পধনু' বইয়ের শুটিংয়ে দিল্লি গিয়েছিলেন, রাজলক্ষ্মী দেবীও ছিলেন সেই শুটিংয়ে। ফিরে আসার কিছুদিন পর আমার সঙ্গে একদিন রাজলক্ষ্মীদেবীর দেখা হতে, তিনি বললেন, 'জানো, নীলিমা, তোমার স্বামীটি যা বজ্জাত না, আমাকে দিয়ে ওর গেঞ্জি কাচিয়ে নিয়েছে, ভাবতে পার?' ইতিমধ্যে পেছনে দাঁড়ানো ভানু উত্তর করে, 'ওহ! নীলিমার কাছে আমার নামে নালিশ করা হচ্ছে, আর তুমি যে আমার পকেট মাইর‍্যা, বিড়ি খাইয়া শেষ করছ, সেইটাতো কইলা না? যাউক গিয়া আমি তো ওইটা তোমারে ঘুষ দিছি!'

এমন এক ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতি বছর 'শহিদ দিবসে' অবশ্য করণীয় কর্মতালিকা অনুসারে শত ব্যস্ততার মধ্যেও একটু সময় বার করে মহাকরণে উপস্থিত হয়ে শ্রদ্ধেয় ক্ষুদিরাম, বিনয়, বাদল, দীনেশ প্রমুখ বিপ্লবী শহিদের ফটোতে মালা দিয়ে প্রণাম জানাতে ভুলতেন না।

নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায়

চারু অ্যাভিন্যু, কলকাতা
৪ ডিসেম্বর ২০০৮

একতারা ছবিতে (১৯৫৭) : বেচু দত্ত, সন্তোষ সিংহ, হরিধন, তুলসী, নৃপতি, ভানু ও রঞ্জিত রায়

মৃত্যু! কিছুই নয়

'মৃত্যু'! কিছুই নয়— মরতে একদিন হবেই একথা সবাইয়েরই জানা। তবু ভয়— মৃত্যুভয়! আমার জীবনের বেশ কয়েকটা বছর আমাকে এই এক ভয়েই কাটাতে হয়েছে। ভয় থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায়, বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে সাহস ভিক্ষে করেছি, জানতে চেয়েছি, মৃত্যুভয় তাদেরও আছে কিনা? উত্তর যা পেয়েছি, মামুলি সে উত্তর। আমারই জানা।

একটা সময় এল, যখন মনে হত, আশপাশে অনেকেই তো দেখি সাহসে ভর করে দিব্যি চলেছে, তবে মিছিমিছি আমিই বা এত দুর্বল কেন? উত্তরের আশায় অন্ধকারে হাতড়ে চলেছি— কোথায় গেলে, কার কাছে গেলে এই মৃত্যুভয়কে জয় করবই!

অবশেষে একদিন চোখের সামনে ভেসে উঠল এক চেহারা। আমার অতি পরিচিত, কৈশোরের উপাস্য— দীনেশদা (বিনয়, বাদল, দীনেশ), হাসতে হাসতে যিনি জীবনের ফুটন্ত বেলায় ফাঁসির দড়ি গলায় পরতে পারেন। মৃত্যুভয়কে তুড়ি মেরে তুর্কি নাচন দেখাতে পারেন। ভাবতে বসলাম। শুধু কয়েকটা দিন দীনেশদা বিনয়দার কথা ভাবতে ভাবতে, আমার বহুদিনের ব্যাধি মৃত্যুভয়কে তাড়ালাম। আর তখন, অত্যন্ত দুর্বল স্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও, আমার দাপট দেখে কে?

দীনেশদা, বিনয়দাকে চিনতাম। কিন্তু বাদল (সুধীর গুপ্ত)? তাঁকে কোনওদিন দেখিইনি। পরে শুনেছি তিনি নাকি পাটনায় থাকতেন।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, দীনেশদা, বিনয়দা যদি বিদেশে জন্মাতেন, তবে তাঁদের জীবনী পাঠ্যপুস্তক হত — আমাদের দেশে খাঁটি মানুষ তৈরি হত।

আমার আজও মনে পড়ে, দীনেশদার ফাঁসির পরের দিন, ঢাকার বিখ্যাত (কুখ্যাত) গুন্ডা ভোলা মিঞাকে রাস্তায় গড়াগড়ি দিয়ে বুক চাপড়ে হা-হুতাশ করতে দেখেছি। অথচ এই ভোলাকেই দীনেশদাদের হাতে কি মারটাই না খেতে হয়েছে, ওর অসামাজিক কাজের জন্যে।

কে একজন লিখেছিলেন, 'বঙ্কিমচন্দ্রকে যখন দেখি নাই, তখন তাঁর মূর্তি কল্পনা

করিতাম, যখন দেখিলাম, তখনই সেই কল্পিত মূর্তি লজ্জায় কোথায় লুকাইয়া গেল।' এবার আমি বলছি, ছোটবেলা থেকে বিপ্লবীদের মূর্তি মনে মনে কল্পনা করেছি। তারপর দীনেশদা বিনয়দাদের দেখার পর বিপ্লবীদের পুজো করেছি। কিন্তু ১৯৪৭ সালের পরে দু-চারজন বাদে, যে সব গজিয়ে ওঠা বিপ্লবীদের দেখলাম, তাদের যে কেন দেখলাম বুঝে উঠতে পারিনি। তবে একটা জিনিস বুঝতে পেরেছি, আমার শরীর খারাপের কারণ এইসব গজিয়ে ওঠা, সাজা বিপ্লবীদের বড় বড় বাক্যবাণ শুনে শুনে।

যেদিন বিনয়-বাদল-দীনেশের ছবি মহাকরণের বারান্দায় টাঙিয়ে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হচ্ছিল, সেদিন আমি এক বন্ধুকে একটি জায়গায় নিয়ে বসে আধুনিক নেতাদের বাণী শুনছিলাম। এক নেতা অনবরত একই কথা বললেন, 'ফাঁসির আগে দীনেশের ওজন বেড়েছিল।' আমরা উভয়েই চঞ্চল হয়ে উঠছিলাম। আশ্চর্য, নেতাটি একবারও এ কথা বললেন না যে জেল থেকে লেখা দীনেশদার চিঠিগুলো একসঙ্গে প্রকাশ করা উচিত। কারণ এগুলোর মাধ্যমে অন্তত উত্তরসূরিরা জানতে পারত, কী জাতের দামাল ছেলে আমাদের তখনকার সোনার বাংলায় জন্মেছিল। উত্তেজিত হয়েছিলাম। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভগবান বোধহয় উত্তেজনা প্রশমনের আজব কায়দাটি রপ্ত করিয়ে দেন। চুপচাপ উঠে চলে এসেছিলাম।

দীনেশদাদের মাতৃভক্তির বিশদ আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। নিজের মায়ের সঙ্গে দেশমাতাকে যে তাঁরা কতটা ভালবাসতে পেরেছিলেন, আশা করি সে কথা অনেকেরই জানা।

এখন অবশ্য বেশিরভাগ ভক্তই আন্তর্জাতিক মাতৃভক্ত। অর্থাৎ নিজের দেশমাতৃকার চাইতে বিদেশি মাতৃকার ভক্ত হতে ইচ্ছুক— অর্থাৎ ফাঁকিবাজি। গোড়াতেই গলদ। যারা নিজের ঘরে, নিজের মাকে দেখার সময় পান না, তাঁরাই দৌড়ে যান অন্যের মায়ের প্রসাদপুষ্ট হওয়ার আশায়। তবে এ ব্যাপারে এইসব তথাকথিত মাতৃভক্তদের সঙ্গে তর্কের সাহসও আমার নেই। কারণ এদের বেশিরভাগই অসম্ভব মিথ্যা কথা, অদ্ভুত দ্রুত বলতে অভ্যস্ত।

আগের দিনের বিপ্লবীদের নিয়মানুবর্তিতার কথা শুনলে অবাক হতে হয়। স্বামী বিবেকানন্দের অনুজ ডাঃ ভূপেন দত্তর মুখে শুনেছি, পাঞ্জাবে একটা meeting-এ যাওয়ার সময় দীনেশদার cycle বিগড়ে যায়। Meeting-এ কিন্তু দীনেশদা ঠিক সময়েই পৌঁছেছিলেন। ৪ মাইল রাস্তা cycle কাঁধে নিয়ে দৌড়ে।

ঢাকা। মিডফোর্ড হসপিটাল। পাশ দিয়ে কলকল শব্দে বয়ে চলেছে বুড়িগঙ্গা। বিরাট পাঁচিল দিয়ে ঘেরা চারধার। হাসপাতাল প্রাঙ্গণের পর সবুজ গালচের মতো

মাঠ। অদ্ভুত শান্ত পরিবেশ। I.G.Prison Loman সাহেব হাসপাতালে এসেছেন পরিদর্শনে। বুড়িগঙ্গার তীরে সেই অদ্ভুত শান্ত পরিবেশের মধ্যে হঠাৎ গুলির শব্দ। নিস্তব্ধতাকে খান খান করে দিল সেই শব্দ। সবাই দেখল এক বাঙালি যুবক বুক ফুলিয়ে ধীরে ধীরে সেই সবুজ গালচে পেরিয়ে চলেছে পাঁচিলের ধারে, যার নিচ দিয়েই বয়ে চলেছে বুড়িগঙ্গা। যুবকের সাহসের তারিফ করার সঙ্গে সঙ্গে সবাই দৌড়তে বলে যুবককে, যাতে তাড়াতাড়ি সেই স্থান যুবকটি পরিত্যাগ করতে পারে। যুবকটি শান্ত গম্ভীর। মাঠের মধ্যে হঠাৎ গজিয়ে ওঠে আর এক বঙ্গসন্তান, 'ভদ্রলোক' — পেশায় Contractor (নাম বলব না), জাপটে ধরল যুবকটিকে। না, পকেটে পিস্তল থাকা সত্ত্বেও এবারে আর সেটিকে ব্যবহার করল না যুবকটি। একটি বাঙালি একটি বাঙালি ভীরু বিশ্বাসঘাতককে মারবার জন্যে যুবকটির হাতের ঘুষিই যথেষ্ট ছিল। সদ্ব্যবহার করলেন ঘুষির। 'ভদ্রলোক' Contractor-এর কয়েকটা দাঁত অকালে খসে পড়ল। আর সেই মুহূর্তে সাধারণের চোখে 'ছোটলোক' মেথর 'সুষেন' পাঁচিলের ছোট্ট দরজা খুলে, বিশাল পাঁচিল টপকাবার হাত থেকে অব্যাহতি দিয়েছিল দামাল ছেলে বিনয়দাকে। এটাই পৃথিবী। পরে 'সুষেন'কে পুলিসের অকথ্য অত্যাচারও সহ্য করতে হয়েছিল। ভগবান, তোমার লীলা বোঝা ভার। কিন্তু একটা ব্যাপারে তোমার ওপরে আমার ভীষণ রাগ। তোমার অপার লীলাচ্ছলে এই ধরাধামে অনেক কিছুই তো করলে, কেবল আত্মার নিজস্ব শক্তি দিলে না কেন? যদি এই সামান্য কাজটুকু করতে তাহলে বিনয়দা, দীনেশদার আত্মা, এখনকার বাকসর্বস্ব, অসৎ, বহু রাজনীতিওয়ালাদের মুণ্ড ছিঁড়ে ফেলতেন।

অনেক কথাই লিখতে ইচ্ছে করে। কিন্তু অনভ্যাস মানুষের এক প্রধান শত্রু। আর জীবনের শেষ প্রান্তে এসে এক জায়গায় হোঁচট খেয়েছি, সেই কথা বলেই লেখা শেষ করব।

আমার নাতি একদিন আবদারের ছলে আমায় বলল, 'দাদু গাওয়া ঘি কাকে বলে?' প্রথমে শিশুর এই অজ্ঞতায় হেসে ফেলেছিলাম। কিন্তু পরমুহূর্তে নিজেকে সংযত করলাম। ভেবে দেখলাম, সত্যিই তো এদের কাছে গাওয়া ঘি পৃথিবীর এক অতি অত্যাশ্চর্য বস্তু। এরা তো গরুর দুধের ঘি চোখেই দেখেনি। গব্য ঘৃত এদের কাছে এখন রূপকথা। কুঁচবরণ কন্যার, মেঘবরণ চুলেরই সামিল।

আমার একটা ছোট্ট জিজ্ঞাসা আছে। 'বিপ্লব' বলে একটা বিশেষ শব্দ জীবনভর শুনে আসছি। ১৯৩০-৩২ সাল পর্যন্ত বিপ্লবীদের কথা স্মরণ করে গর্ববোধ করি আমি তাদেরই দেশের ছেলে বলে। কিন্তু এখন 'বিপ্লব' মুখের বুলি। দেওয়ালে দেওয়াল যত 'বিপ্লব'। তবে কি 'বিপ্লবে'র অবস্থাও গাওয়া ঘি-এর মতন হবে। আমার ভয়,

জীবিত অবস্থাতেই না 'বিপ্লব' এই শব্দটাকে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুরমার ঝুলিতে' অলঙ্কৃত দেখে যেতে হয়। আমার ছাত্র জীবনের প্রিয় কবি সুনির্মল বসু রচিত 'বিবর্তন' কবিতাটি স্মরণ করে এবং শহিদত্রয়কে প্রণাম জানিয়ে এই প্রবন্ধ শেষ করছি।

শহিদের তাজা লোহিত-রক্তে
সিক্ত হলো যে ধূলি
সেই ধূলি হলো রাঙা-চন্দন—
ললাটে লইনু তুলি,
শহিদের গলে ফাঁসির রজ্জু,—
ইজ্জত তার বাড়ে—
মালা হয়ে যায় মহা-মহিমায়—
গলায় পরিনু তারে।
পরাধীন দেশে ডুবে গেছে যারা
কলঙ্ক-কালিমাতে,—
জেগে রবে তারা সোনার আখরে
নব ইতিহাস পাতে।

বিপিন গুপ্তর চক্ষু অপারেশনে (১৯৫৭) ঋষীকেশ মুখার্জি, শ্যামল মিত্র, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, নীহার মুকি ও মন্টু বসু।

মানুষ হাসে কেন?

মানুষ হাসে কেন? হাসির নিশ্চয় কোনও কারণ আছে যা থেকে মানুষ হাসে। স্থান, কাল, পাত্র ভেদে অবশ্য নানা রকমের হাসি হয়। রসরাজ রাজশেখর বসু (পরশুরাম) একবার আমাদের বলেছিলেন— 'জগতের সমস্ত সত্য কথাই হাসির কথা' তবে সেটা কীভাবে এবং কোথায় বলতে হবে, সেটা জানা দরকার। হাসির একটা সংজ্ঞা অনেকদিন থেকে শোনা আছে, কে যে বলেছিলেন মনে নেই "When the imagination of a person is beaten without concerning his or her pocket and mind, laughter is inevitable there" অর্থাৎ, যখন কোনও ব্যক্তির কল্পনাকে আঘাত করা হয় এবং এর বিনিময়ে তাকে অর্থ ও মানসিক কোনও পরিশ্রম করতে হয় না, তখন হাসি অবশ্যম্ভাবীভাবেই আসবে।

দৃষ্টান্ত হিসাবে ধরা যেতে পারে একটি পাঁচ বছরের ছেলে রাস্তায় আছাড় খেল— কেউ হাসে কি? হাসে না— কারণ imagination is not beaten ধরেই নেওয়া হয় বাচ্চা ছেলে তো আছাড় খাবেই। কিন্তু একজন বয়স্ক লোক রাস্তায় আছাড় খেলেই সবাই হেসে ফেলে। কিন্তু যিনি আছাড় খেলেন তাঁর বাবা, ভাই, ছেলে, মেয়ে কিন্তু হাসে না— কারণ 'mind is concerned'। দু'জন কালা (Deaf) ব্যক্তির কথোপকথন নিয়ে অনেক হাসির মুহূর্ত, নাটক, সিনেমাও তৈরি হয়েছে, কিন্তু বাস্তবে কালা দুই ব্যক্তির আপনার লোক কখনই হাসির অংশীদার হতে পারে না।

আমি জানি একটি Aircraft Land করার আগে হঠাৎ জানা গেল যে চাকা আটকে গেছে, Belly Landing হবে। ভেতরে সবাই মিলে ভগবান, যিশু, আল্লা যার যে আছে ডাকতে শুরু করে— কিন্তু যেই Safe landing হল, দেখা গেল একজন আরেক জনের মুখের দিকে তাকিয়ে কীরকম যেন অদ্ভুতভাবে হেসে উঠল।

রাস্তায় গাড়ি চাপা পড়তে গিয়ে হঠাৎ escaped হলেও যে ব্যক্তি চাপা পড়ছিলেন তিনি হঠাৎ হেসে ওঠেন। এর একমাত্র কারণ হল— কোথায় মারা যাচ্ছিলেন কিন্তু কিছুই হল না। অর্থাৎ "imagination is completely beaten without concerning anything."

আমি আমার ৩৫ বছরের অভিনয় জীবনে হাসির ব্যাপারে এই সংজ্ঞাই মেনে চলেছি।

এই সংজ্ঞার ওপর Situation তৈরি হলে হাসির মার নেই। তবে কথায় 'throw' কিন্তু ভীষণ important।

একই কথা একজন বললেন, লোকে খুব হাসল— দেখা গেল আরেকজন যখন বললেন শুধু একটু মুচকি হাসি হল অথবা হাসিই হল না।

স্থান কাল ভেদে হাসির তারতম্য উল্লেখ করেছি, তার কারণ হল, ভুল ইংরেজি বলা দিয়ে অনেক হাসির situation তৈরি করা যায়, কিন্তু যিনি ইংরেজি জানেন না, তাঁর কাছে ভুল-শুদ্ধ কোনওটাই কিছুই করবে না। slap stick comedy আমাদের দেশে বিশেষ আদর পায় না— তার কারণ সমানে প্রশ্ন হতে থাকে এ হয় নাকি? ও হয় নাকি? তবেই বুঝুন একজনের মনে যদি নাগাড়ে এই পরিমাণ 'নাকি'-র সমাবেশ হয় তবে তিনি হাসবেন কখন? এরপর আছে অহেতুক হাত-পা নাড়া, মস্ত বড় পেট দেখিয়ে এবং দুলিয়ে হাসাবার চেষ্টা। অবশ্য এ ধরনের রসিকতা আজকাল আর accepted হয় না, আমাদের ছোটবেলায়ও এর নিন্দে শুনেছি।

পরিশেষে বলি, আমাদের দেশে কিছু বিদগ্ধ (সংখ্যায় অতি নগণ্য) ব্যক্তি আছে যারা ছেঁড়া কাঁথা, ভাঙা চৌকি, অভাবের সংসার দেখলে (নাটকে এবং সিনেমায়) বাস্তব বলেন, আর ঝাড়লণ্ঠন সমেত জমিদারবাড়ি দেখলে অবাস্তব বলেন। এরাই আবার ইংরেজি Slapstick comedy দেখে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন। কিন্তু দেশি comedianদের অভিনয়ে Slapstick-এর ছোঁয়াচ মাত্র দেখলেও 'ভাঁড়' বলেন।

এদের সম্বন্ধে চিন্তিত হওয়ার কিছুই নেই, কারণ এটা হল তাদের নিজেদের, সর্বসাধারণের কাছে, উচ্চমার্গের লোক প্রমাণিত করা স্বকল্পিত বিলাসিতা। যেমন সেই প্রসঙ্গে বলতে পারি— আমি একবার একটি নাটকে বলেছিলাম— 'মাসিমা মালপোয়া খামু'। এই কথা শুনে আজ সাতাশ বৎসর ধরে মানুষ হাসছেন। আমি কিন্তু হাসিনি বরং ভোজনে দক্ষিণা পেয়েছি এবং এখনও পাচ্ছি। দক্ষিণা পাচ্ছি সেটা আমার 'Birth right', কিন্তু অন্য সকলে হাসে কেন!

একতারা ছবিতে (১৯৫৭) ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

স্মৃতির রেখা

শৌখিন নাটকের দলে অভিনয় করে বেড়ানোর শখের সময় সেটা। চেহারাটা ছিল একেবারেই রোগাপটকা। বুকের ছাতি তখন আটাশ ইঞ্চি। একটু জোরে হাওয়া বইলে কাত হয়ে পথ চলতে হয় আর কি। এই কারণেই বোধহয় কোনও নাটকে নায়কের পার্টে ডাক পড়ত না। তবে কঠিন চরিত্রে অভিনয় করতে পারতাম। 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে চাণক্যের ভূমিকায় আমার অভিনয় দেখে পরিচালক সুশীল মজুমদারের সহকারী ভুজঙ্গ ব্যানার্জির ভাল লাগে। তিনিই আমায় প্রথম ছবির জগতে নিয়ে আসেন। ছবিতে প্রথম অভিনয় করার ব্যাপারটা খুব মজার। ১৯৪৬ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি আমার বিয়ে হয়েছিল। হাতে তখনও সুতো বাঁধা রয়েছে। শ্বশুরবাড়িতে গেছি দ্বিরাগমনে। সেখানেই ছুটে এলেন ভুজঙ্গবাবু। বললেন এক্ষুনি যেতে হবে স্টুডিওতে। শুটিং আছে।

কথায় বলে না স্বর্গে গিয়েও ঢেঁকি ধান ভানে। আমার অবস্থাটাও ঠিক তাই। বিয়ের পর প্রথম শ্বশুরবাড়িতে এসেছি। সুখ আর সইল না। যেতেই হল তক্ষুনি। সেই দিনটি ছিল ২৬ ফেব্রুয়ারি। স্টুডিওতে গিয়ে দেখি ছবির পরিচালক বিভূতি চক্রবর্তী যেন আমার জন্যেই বসে আছেন। আমাকে দেখামাত্র তাঁর বেশ পছন্দ হল। বললেন, আমার ছবিতে দুর্ভিক্ষপীড়িত চিমসে চেহারার একটা চরিত্র আছে। তুমি করবে এই পার্ট?

আমার তখন ওই রকমই চেহারা। টালিগঞ্জে পরিচিত শিল্পীদের মধ্যে এমন চেহারার কাউকে নাকি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। বিভূতিবাবুর নির্দেশে তক্ষুনি আমার মুখে রঙ মাখিয়ে আর রঙিন জামাকাপড় পরিয়ে একেবারে ক্যামেরার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল। সংলাপ ছিল আমি বউকে বলছি, আমার মেয়ে খেঁদিকে বিক্রি করে দিয়ে এলাম এক টাকায়।

ডায়লগ বলেই খেয়াল হল। তাকিয়ে দেখি বউ নেই পাশে। আমার তখন শুধু ক্লোজ আপ শট নেওয়া হচ্ছিল। একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আমার বউ কই?

বউ তখন খাটের তলা থেকে বেরিয়ে এলেন। এবার তাঁকে মিড শটে ধরা হবে। আমি ওঁর অভিনয় দেখে আশ্চর্য হয়ে বললাম, ইনি কে?

পরে জানলাম, উনি মিনার্ভা থিয়েটারের 'আত্মদর্শন' নাটকের রেণুবালা (সুখ)। ওই নাটকে সুখ আর দুঃখ দুটি চরিত্রে অভিনয় করে তাঁর নাম হয়ে যায় সুখ।

আমার সেই প্রথম ছবির নাম 'জাগরণ'। পরিচালক বিভূতি চক্রবর্তী এক সময় প্রমথেশ বড়ুয়ার সহকারী ছিলেন। এই ছবিতেই প্রথম সুর দেন সুধীরলাল চক্রবর্তী।

সেই শুরু। তারপর থেকে আর থেমে থাকিনি। একের পর এক ছবিতে অভিনয় করে গেছি। এখনও করছি। একষট্টি বছরের জীবনে পঁয়ত্রিশটা বছর কেটে গেল এই ফিল্মের জগতে। ছবিও করেছি তিনশোরও বেশি। তবে কমেডিয়ান হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যাব তা কোনও দিনও ভাবতে পারিনি। শিল্পী কখনও কোনও বিশেষ ইমেজের মধ্যে পড়ে গেলে সান্ত্বনা পায় না। আমার শিল্পী জীবনে শুধুই কৌতুকাভিনেতার স্বীকৃতি। এটা বড় দুঃখ হয়ে রয়ে গেল। এমনকি আমার অভিনয় দেখে আমারই মাসিমা আরেকজনকে ডেকে বলেছিলেন, ভানুর অভিনয় দেখেছেন দিদি? কী সুন্দর ফাজলামি করে।

তবে আনন্দদায়ক মুহূর্তও এসেছে জীবনে। নিজে ছবি করতে গিয়েছিলাম 'কাঞ্চনমূল্য'। এই ছবির প্রধান অভিনেতা ছিলেন ছবি বিশ্বাস। স্টুডিওতে শুটিং হচ্ছিল। ঠিক লাঞ্চটাইমেই কী একটা কারণে প্রযোজক হিসেবে আমাকে পরিবেশকের অফিসে চলে যেতে হয়। বিকেল চারটের সময় ফিরে এসে দেখি, ছবিদা তখনও লাঞ্চ খাননি। অন্যদের জিজ্ঞেস করে জানলাম, ছবিদা নাকি অনবরতই বলছেন, ভানু না খেয়ে চলে গেল। ও আগে ফিরে আসুক। তারপরে খাব।

এখন মনে হয়, ওইরকম মানুষকেই 'দাদা' বলা যায়। কিন্তু এমন দাদা পাওয়া যায় কি?

ছবির জগতে আমার আরেক প্রিয় শিল্পী ছিলেন জহর রায়। আমরা একই ধরনের অভিনয় করতাম। কিন্তু আমাদের মধ্যে কোনওদিন পেশাগত ঈর্ষা ছিল না। বরং ও আমাকে খুবই ভালবাসত। বরাবর রোগা ছিলাম বলেই ও আমায় যে চোখে চোখে রাখত সেটা সব সময় টের পেতাম।

এই গরমের দিনে জহরের একটা চলতি কৌতুক ছিল আমায় নিয়ে। সবাই যখন ঘেমে-নেয়ে শুটিং করতেন তখন ছবি বিশ্বাস বা পাহাড়ী সান্যালকে চেঁচিয়ে জহর বলত, ছবিদা আজ ভীষণ গরম। ওঁরা বলতেন, ভীষণ গরম তা তো ফিল করছি। দেখতেও পাচ্ছি। জহর বলত, কিন্তু আজ হল সবচেয়ে গরম।

কেন?

আজ ভেনো ঘামছে।

সত্যি আমার ঘাম কম হত। জহরের কাছে আমি ছিলাম গরমের ব্যারোমিটার। বাংলা ছবিতে আমরা দুজনে কমেডিয়ান জুটি হয়ে গিয়েছিলাম। বিদেশে লরেল-হার্ডি, ডিন-মার্টিন, জেরি-লুইস এঁরা শুধু এক ছবিতে কাজ করে ব্র্যাকেটের সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু আমরা দুজনে বিভিন্ন ছবিতে কাজ করেও জহর-ভানু ব্র্যাকেট হয়ে গিয়েছিলাম। তাছাড়া আমাদের নাম দিয়ে ছবিরও নাম রাখা হয়েছিল 'ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিস্টেন্ট', 'ভানু পেল লটারি', 'এ জহর সে জহর নয়' ইত্যাদি। এর এখন? আজকাল বাংলা ছবিতে আমাদের মতো কমেডিয়ানদের তো করার কিছু নেই। একজনকে রাখতে হয় তাই রাখে। এখন কমেডিয়ান মানেই হচ্ছে লাগিয়ে দাও, হয়ে যাবে— এই ভাব। আগে কিন্তু তা ছিল না। তখন কমেডির সিচুয়েশন তৈরি করে কমেডিয়ানদের জন্য রোল তৈরি হত। ছবির গল্পে কমেডিয়ানদের একটা মূল্য ছিল। এখন আমরা হচ্ছি ইত্যাদির দলে।

অনেকে মনে করেন, চান্স পেলে অভিনয় করতে পারব না কেন? কিন্তু চার-পাঁচখানা ছবিতে অভিনয় করে সম্পূর্ণ বিফল হয়েও যশোভাগ্যের চূড়ায় উঠতে দেখেছি একমাত্র উত্তমকুমারকে। কী চেষ্টা, কী ধৈর্য, কী সাধনা ছিল তার।

গোড়া থেকে আমি ওর সঙ্গে ছিলাম। নির্মল দে-র 'বসু পরিবার' ছবিতে দেখেছি দুটো লাইন ঠিক করে বলার জন্য অন্তত চল্লিশ মিনিট সময় দিতে পারত উত্তম।

তবে কমেডিয়ানের সব থেকে বড় ট্র্যাজেডি কী জানেন, আমার মা যেদিন মারা গেলেন। কেওড়াতলা শ্মশানে তাঁর শবদেহ নিয়ে চলেছি। আশপাশের জনসাধারণ আমায় দেখে হাসছে আর বলছে, ওই দ্যাখ ভানু কাঁদছে।

আমি জানি, যেদিন আমিও মরব, আমাকে শ্মশানে নিয়ে যাবে তখন ওই জাতের লোকই হেসে বলবে, ওই দ্যাখ শালার মাথাটা কেমন অদ্ভুত নড়ছে।

'ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিট্যান্ট' ছবিতে ভানু, জহর রায় ও পাহাড়ী সান্যাল—১৯৭১

জহর রায়

জহর রায়ের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় চিত্র-পরিচালক সুশীল মজুমদারের বাড়িতে। সালটা হবে হয়ত ১৯৪১ কি '৪২। পুরনো পরিচয়ের সুবাদে ঢাকা থেকে এসে আমি ওই বাড়িতেই উঠেছিলাম। সুশীলদার স্ত্রী পাটনার মেয়ে, সেই পরিচয়ে জহর আসত ওই বাড়িতে। ওখানে Great Dictator ছবিতে চার্লি চ্যাপলিনের হিটলারের ভূমিকা অনুসরণে জহর হিটলারের অভিনয় করেছে কত — এক কথায় অদ্ভুত ছিল সেই অভিনয়।

কমেডিয়ান হিসাবে চলচ্চিত্রে অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে জহর অনেক কিছু দিয়ে গেছে কিন্তু তার সবচাইতে বড় গৌরব, কৌতুকাভিনেতা হিসেবে বাংলাদেশের একটি রঙ্গমঞ্চকে বাঁচিয়ে রাখা— সে না থাকলে রঙমহলকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হত কিনা সন্দেহ।

গত কয়েকটা বছর জহর ছিল শিল্পী সংসদে, আর আমি অভিনেতৃ সঙ্ঘে। এই ঘটনা আমাদের মনের মিল হওয়ার পথে কোনও অন্তরায় সৃষ্টি করেনি। আমরা পরস্পর নিজস্ব চিন্তাভাবনা নিয়ে পথ চলেছি, কখনও কোনও সঙ্ঘর্ষে আসবার প্রয়োজন অনুভব করিনি।

কৌতুকাভিনেতা হিসেবে জহর একই সঙ্গে লোককে হাসিয়েছে এবং কাঁদিয়েছে— এ ক্ষমতা কতজনের আছে? তবু বলব, কৌতুক অভিনয় এখনও পর্যন্ত আমাদের দেশে সর্বজনস্বীকৃত শিল্পকলার মর্যাদা পায়নি। এর মূল কারণ আমার মনে হয়, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একটা অহেতুক দম্ভ— হাসির কথায় সহজেই হাসলে পাছে লোকের কাছে ছোট হয়ে যেতে হয় তাই তাঁরা একটু কম হাসেন। তফাতটা সহজেই ধরা পড়ে যখন একই কৌতুকাভিনয় অফিসের ও স্কুলের কোনও ফাংশানে করা হয়। অফিসের বাবুরা হয়ত হাসতেই চান না, অথচ স্কুলের ছেলেমেয়েরা হেসে লুটোপুটি।

জহর অনেক ছবিতে কৌতুকাভিনয় করেছে; আমিও করেছি। সেখানে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে আমাদের কম পরিশ্রম হয়নি। কোনও একটা দৃশ্যে হয়ত ৬০টা শট, তার মধ্যে ৫৮টাতেই নায়ক-নায়িকা, বাকি দুটিতে আমরা। এর মধ্যেই আমাদের যা কিছু

করে নিতে হয়েছে। অন্য অভিনেতাদের তুলে ধরার একটা প্রচেষ্টা থাকে কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে সেটা একেবারেই হয়নি। হয়ত নায়ক-নায়িকা কথা বলছেন, ফাঁকা ফাঁকা লাগছে, আমাদের তার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। গত পনেরো-বিশ বছর ধরেই আমাদের শুনতে হচ্ছে, 'একটা কিছু করে নাও ভাই, দর্শক যাতে হাসে।' বাংলা ছবির এটাই হচ্ছে দেউলেপনা— একটা হাসির পরিস্থিতি সৃষ্টি করবার ক্ষমতাও সকলে হারিয়ে বসেছেন।

আমাদের পূর্বসুরিদের এই একটা জায়গায় অনেক সুবিধা ছিল।

বাংলাদেশে প্রযোজক হাসির ছবি করতে আসেন হয় প্রথম দিকে, নয়ত যখন হাতে আর পয়সা থাকে না। এখনও মনে আছে, বিকাশ রায় 'অর্ধাঙ্গিনী' ছবি করার সময় বলেছিলেন, 'ভানু, সব তোর ওপর নির্ভর করছে।' কিন্তু এই ছবিটা হিট করার পর আর কমেডি ছবি না— বড় বড় অভিনেতা-অভিনেত্রী নিয়ে এমন ছবি যেখানে প্রেম-টেম আছে। অনেকে আসেন আমার কাছে, বলেন, 'ভানুবাবু, একটা ছবি করছি। বোঝেনই তো।' আমি বলি, 'খুব বুঝেছি, আমার কাছে যখন এসেছেন তখনই বুঝেছি।' তবে তপন সিংহ, তরুণ মজুমদারদের মতো পরিচালকও আছেন যাঁরা জানেন কমেডিয়ানদের রোলটা কেমন হবে এবং যথাযথভাবে তাঁরা ব্যবহারও করেন কমেডিয়ানদের। আবার এমন পরিচালকও আছেন যাঁরা বলেন, 'রিলিফের কোনও প্রয়োজন নেই।'

তাঁদের কথা শুনে মনে হয় চারশো বছর বাদে শেক্সপিয়রকে সংশোধন করতেই তাঁরা আবির্ভূত হয়েছেন। এই পরিস্থিতির মধ্যেই কমেডিয়ানদের কাজ করতে হয়। জহরকেও কাজ করতে হয়েছে। সুতরাং ইংরেজি ছবিতে লরেল-হার্ডিকে নিয়ে যেমন ছবি তৈরি করা হয়েছে এককালে, সেইরকম ছবি এখানে তৈরি করার সুযোগ নেই। এছাড়া লরেল-হার্ডির ছবিতে স্ল্যাপস্টিক অভিনয় ছবির একটা অঙ্গ। বাংলাদেশের দর্শক বাংলা ছবিতে স্ল্যাপস্টিক অভিনয় গ্রহণ করবে বলে মনে হয় না।

কম ছবিতে জহর অভিনয় করেনি; আমিও অনেক ছবিতে অভিনয় করেছি। বাংলা চলচ্চিত্র জগতে কৌতুকাভিনেতা হিসেবে জহরের দান কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। ওর যেটা সব চাইতে বড় গুণ ছিল সেটা হচ্ছে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব— যে কোনও ঘটনা সঙ্গে সঙ্গে কৌতুকে রূপ দিতে পারত, একটা ঘটনা বানাতে পারত, যখন-তখন বানাতে পারত! আর একটা গুণ হচ্ছে Physical fitness. নাকের ওপর একটা ঘুষি মারলে সত্যি সত্যি মারা যায় না, সেটা অভিনয়, কিন্তু জহর সমস্ত শরীরটা ঠেলে দিয়ে এমনভাবে পড়ে যেত যে সেটা কিছুতেই অভিনয় বলে মনে হত না। কিন্তু আমাদের অভিনয়ের মূল্য বিশেষ কেউ দিতে চাইতেন না— এই অন্যায়,

অবিচার আমরা নীরবে মাথা পেতে নিইনি কখনও। 'বসু পরিবার' ছবিতে আমরা দুজনেই অভিনয় করেছি কিন্তু প্রচারের সময় শুধু উত্তম-সুচিত্রার নাম। কিন্তু এমন ঝামেলা আরম্ভ হল যে Publicity officer বাধ্য হলেন আমাদের নাম দিতে। জহর ছিল অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় মানুষ, কোনও ঝামেলার মধ্যে যেতে চাইত না। অনেক ক্ষেত্রেই আমাকে বলেছে, 'চেপে যা, ঝামেলা করিস না।'

জহর সত্যজিৎ রায় এবং ঋত্বিক ঘটক উভয়ের ছবিতে অভিনয় করেছে; ওর যা ভূমিকা তা যথাযথই পালন করেছে। তবু ঋত্বিক ঘটকের 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' ছবিতে একটা কনস্টেবলের ভূমিকায় ওর যা অভিনয় তা অন্য কেউ করতে পারতেন কিনা সন্দেহ— এই অভিমতটা বিশেষ করে আমার স্ত্রীর। কিন্তু আমাদের দেশে কমেডিয়ানদের দিয়ে একই ধরনের অভিনয় করানোর ঝোঁক প্রচণ্ড! এবং এর ফলে একটা একঘেঁয়েমি ভাব বিভিন্ন কমেডিয়ানদের অভিনয়ে আসতে বাধ্য। যেমন আমার বেলায় বাঙাল ভাষায় কথা বলানোটা অনেকেই চান। বাঙাল কথা বললেই যদি কমিক হত, তবে যে কোনও পূর্ববঙ্গের লোক দিয়েই কমিক করানো যেত। বাঙাল ভাষায় কথা বলার কারণ আমার ভিন্ন। ঢাকা থেকে কলকাতায় এসে অভিনয় করতে চাইলে অনেকে বলেছেন, 'এখনও জিভে আড় ভাঙেনি, অভিনয় করবেন কী?' আমিও বলেছি, 'জিভের আড় তো কোনওদিন ভাঙবে না, সুতরাং পরিষ্কার ভাষা আমি কোনওদিন বলব না।' তাই অনেকগুলো ছবিতে আমাকে বাঙাল ভাষায় ও জহরকে দু-একটি ছবিতে এ দেশীয় ভাষায় কথা বলে অভিনয় করতে হয়েছে। অথচ জহরও পূর্ববঙ্গের লোক, ওর বাবা-মা পূর্ববঙ্গের ভাষায় কথা বলেন।

জহর অভিনয় ক্ষমতাটা খানিকটা পেয়েছিল পৈতৃক সূত্রে। ওর বাবা সতু রায় সাইলেন্ট যুগের একজন নামকরা অভিনেতা। British Dominion Film Co.-র ছবিতে অভিনয় করেছেন। আর অভিনয় কিছু কিছু আমরা শিখেছি পূর্বসূরিদের কাছ থেকে। তুলসী লাহিড়ী, তুলসী চক্রবর্তী, কুমার মিত্র প্রমুখ সকলেই ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাবান কমেডিয়ান। কারও বিশেষ প্রভাব আমাদের কারও ওপর আছে বলে মনে হয় না। আজকাল অনেকে বলেন, নাট্যান্দোলন করছেন, যেন আগের লোকেরা কিছু জানতেন না। তাঁরা জানতেন বলেই আমরা আজ আন্দোলন করতে পারছি— তাঁরা অভিনয় করে গেছেন বলেই আমরা অভিনয় করতে পেরেছি। তবে আগের যুগে কমেডিয়ানদের সামনে যে বাধানিষেধ ছিল, যে সীমাবদ্ধতা ছিল, এখন তা অনেকটা কেটে গেছে। কমেডিয়ানকে প্রধান ভূমিকায় নিয়ে ছবি আমাদের সময়েই হয়েছে— কমেডিয়ানদের নাম বা আর্টিস্টের নাম দিয়ে ছবি করা আমাদের জীবনেই ঘটেছে। বড় বড় নায়ক-নায়িকার ভিড়ে আমরা হারিয়ে যাইনি; লোকে আমাদের

মনে রেখেছে— তাদের অজস্র ভালবাসা আমরা পেয়েছি। নায়ককে হয়ত ভালবাসে মেয়েরা, নায়িকাকে ছেলেরা— আমাদের ভালবাসে ৬ বছর থেকে ৮০ বছর পর্যন্ত সকলে। দু-একটা জায়গা থেকে যে গালাগালিটুকু আমরা খেয়েছি, আমি ও জহর তা মানুষের স্ব স্ব ভঙ্গিতে ভালবাসার অভিব্যক্তি বলেই মনে করেছি।

জহর আর আমার বন্ধুত্বের মধ্যে কোনও ফাঁক ছিল না। অনেকে আমাদের উভয়ের কাছে উভয়ের নামে আজেবাজে কথা বলে সেই বন্ধুত্বের চিড় ধরানোর চেষ্টা করত। কিন্তু ব্যাপারটা তো অত সোজা নয়। আমরা প্রকৃতই দুজনকে চিনতাম। এ প্রসঙ্গে বলি, জহর পড়াশোনা করত। ওর মেসের ঘরে প্রচুর বই-পত্তর থাকত। একজন ব্যক্তি আমার কাছে এসে জহরের নামে বলতে লাগল, 'জানলেন, জহরের বাড়িতে অনেক বই দেখলাম। আসলে ওসব বুজরুকি, পড়াশোনা মোটেই করে না।' আমি বললাম, 'হ্যাঁ, আমি কিন্তু আমার সব বইতে মলাট দিয়ে রেখেছি, পাছে জহরের কাছে গিয়ে আবার না বলেন, ভানুটা কিসসু পড়াশোনা করে না!' জহরও অনেককে এ ধরনের কথা বলে দিত যারাই আমার নামে কিছু বলতে গেছে তার কাছে। আমাদের এই ভালবাসা একেবারে ফ্যামেলি পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। আমার ছেলেমেয়ে এবং স্ত্রীর মতে জহরের থেকে কেউ ভাল কমিক অ্যাকটিং করতে পারে না। আবার জহরকেও কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, 'কী আপনি একটা গাড়িটাড়ি করতে পারলেন না!' তার উত্তরে সে অম্লানবদনে আন্তরিকভাবেই বলে দিত, 'কেন ভানু তো করেছে!' আমার কিছু হলে ওর কী গর্ব! আমার ছেলে বাইরে গেছে, তাতেও ওর কী আনন্দ! আমি বলতে চাইছি, আমাদের মধ্যে একটা সুদূর বন্ধুত্বের বাঁধন ছিল।

এখন দুঃখ হয়, বাংলাদেশে ত্রিশ বছর যাবৎ একটা ব্র্যাকেট ছিল, 'জহর-ভানু'। জহর সেই ব্র্যাকেটটা ভেঙে দিয়ে চলে গেল।

উজ্জ্বলার ফাংশনে (১৯৫৬) : রবীন মজুমদার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন চ্যাটার্জি, ইলা বসু, বাণী ঘোষাল, সলিল চৌধুরি। (দাঁড়িয়ে) বালসারা, শ্যামল মিত্র, মন্টু বসু ও জহর রায়।

আমাদের সংস্কৃতি কোন পথে

আজকাল একটা কথা প্রায়ই শোনা যায় অপসংস্কৃতি। আমি মনে করি এটা কোনও বাংলা নয়। এই কথাটির দ্বারা যেটা বোঝানো হয় সেটা হচ্ছে কু-সংস্কৃতি। সুতরাং সু-সংস্কৃতি এবং কু-সংস্কৃতি এই দুই-এর মধ্যে বেছে নিতে হবে— আমরা কোনটার চর্চা করব।

একজন শিল্পী বা অভিনেতার সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। সাধারণ মানুষের মতোই সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে (কমবেশি) অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সে তার দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা থেকে সমাজের দোষ-ত্রুটিগুলো জানতে পারে এবং তার শিল্পকর্ম বা অভিনয়ের মধ্য দিয়ে প্রতিকারের পথনির্দেশ দিতে পারে। আমি মনে করি এটা প্রতিটি শিল্পীর সামাজিক দায়িত্ব। আমি যেহেতু কৌতুকাভিনেতা হিসেবে পরিচিত, সুতরাং আমিও চেষ্টা করি কৌতুকের মধ্য দিয়ে সামাজিক সমস্যাগুলো তুলে ধরার। আজকাল সাংস্কৃতিক জগতে একটা ক্রমাবনতি লক্ষ্য করছি। সমাজে সবসময়ই ভাল-মন্দ উভয় মানুষই থাকে। যখন ভালর সংখ্যা কমে আসে তখনই খারাপটা চোখে পড়ে। যদিও আগের তুলনায় বর্তমান সাংস্কৃতিক জগতে শিক্ষিতের সংখ্যা বেশি। কিন্তু আমার মনে হয় এদের প্রকৃত শিক্ষার অভাব আছে অথবা শিক্ষার হজম কম। মুখস্থ করা কিছু বড় বড় কথা বলে লোককে ঠকানোর চেষ্টা চলছে। এর জন্য সাংস্কৃতিক জগতের সবাই কমবেশি দায়ী। আমি নিজেও যদি লোক ঠকানোর জন্য আমার উপলব্ধির বাইরে কিছু করে থাকি, আমিও সমান দায়ী।

আমাদের দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সুস্থ সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে একটা বাধা হিসেবে কাজ করে। ক্রমাগত মুদ্রাস্ফীতির ফলে সাধারণ মানুষ দিন দিন দারিদ্র্যের দিকে এগিয়ে চলেছে। অপরদিকে যারা ধনী তারা আরও ধনী হচ্ছে। আমাদের দেশের এই ধনীরাই সমস্ত কিছুর নির্ধারক হয়ে বসে আছে। তারাই শুধুমাত্র টাকার লোভে দেশের সিনেমা-নাটকের মান নামিয়ে দিচ্ছে। শুধু তাই নয়, দেশের যুব সমাজের নীতি-নৈতিকতার মান যাতে না গড়ে উঠতে পারে তার জন্য তারা অনবরত এই কু-সংস্কৃতির প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। যার ফল হচ্ছে, দেশের যুবকরা, যারা সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবে তাদের নৈতিকতার মান ভেঙে যাচ্ছে এবং সত্যিকারের

মানুষ সৃষ্টির ক্ষেত্রেও বিরাট বাধা হিসেবে কাজ করছে। দুর্ভাগ্যের বিষয়— যারা এই কাজে সাহায্য করছে সেই সমস্ত তথাকথিত শিক্ষিতের দল দেশের অগণিত অশিক্ষিত এবং স্বল্পশিক্ষিত মানুষকে না চেনার ফলে সব দুর্বোধ্য শিল্প সৃষ্টি করছে, যেটা সাধারণ মানুষের বোধগম্য নয়। বড়লোকদের তাঁবেদারি করার জন্য দেশের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা এই সমস্ত কাজ করে যাচ্ছেন এবং আমার ধারণা এর পেছনে বিদেশি সাহায্য কাজ করছে। আমি জানি এটা একটা Agent Provocation. তাই যদি না হবে তবে Sensor Board থাকা সত্ত্বেও এ ধরনের সিনেমা নাটক হচ্ছে কী করে? এ অবস্থা থেকে যদি সংস্কৃতিকে বাঁচাতে হয় তার জন্য প্রয়োজন প্রকৃত নিষ্ঠাবান শিল্পীর, যাঁরা এই অর্থনীতিক অসুবিধাকে Fight out করে নিজেরা দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসবেন এবং সাধারণ মানুষের বোঝার মতো সিনেমা, নাটক পরিবেশন করবেন। আমি বিশ্বাস করি, পরিবেশন ঠিকমতো হলে সাধারণ মানুষ সেটা উপলব্ধি করতে পারবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে— চার্লি চ্যাপলিনের কোনও ছবিই সাধারণ মানুষের দুর্বোধ্য নয়। এমন অনেকে আছেন যাঁরা সাধারণ মানুষের জন্য শিল্পসৃষ্টি করবেন বলেই একদিন এগিয়ে এসেছিলেন, মানসিক শূন্যতা অথবা মস্তিষ্কের বহন ক্ষমতা না থাকার ফলে তাঁরা পিছিয়ে গেছেন। আবার অনেকেই ফাঁকির প্রবণতার জন্য কিছুই করতে পারেননি। প্রতিটি শিল্পীকে নিজেকে ঠিক জায়গায় রেখে কাজ করতে হবে। মুখে এক আর কাজে আর এক করে সেটা হবে না। এমনও দেখা যায় যাঁরা এই সমস্ত অশ্লীলতার বিরুদ্ধে বলছেন তাঁরা নিজেরাই তাঁদের নাটকে বা সিনেমাতে অশ্লীলতার চর্চা করছেন। এই করে এর প্রতিকার হয় না। প্রথমে নির্ধারণ করতে হবে কোনটা অশ্লীলতা বা কু-সংস্কৃতি। তারপর তার প্রতিকারের পথে এগিয়ে যেতে হবে। আমি মনে করি যে সংস্কৃতি মানুষের বিকৃত মানসিকতা জাগিয়ে তোলে সেটাই কু-সংস্কৃতি।

এই কু-সংস্কৃতিকে রোধ করতে হলে দেশের প্রকৃত পণ্ডিতদের একটা কমিটি গঠন করা উচিত। যাঁরা Concrete করে বলে আইন চালু করতে পারেন। যেমন ইংরেজ আমলে লালবাজারে Sensoring প্রথা ছিল যেখানে Printed Definition মতো Sensor-কে চলতে হত। যেমন, এক জায়গায় ছিল মহিলার গাত্রবস্ত্র যতই খোলা থাক Nipple দেখানো চলবে না, তা হলে এটা একটা Definite provocation। এর মধ্যে দিয়েই একটা সীমা বাঁধা ছিল। পুরীর মন্দির অথবা কোনারকের মন্দিরের গায়ে শত শত যে সমস্ত উৎকীর্ণ মূর্তি আছে তা অশ্লীল নয়— কিন্তু তারই যদি কোনও একটি ছবি কেউ বিক্রি করে বা কেনে সে আইনত দণ্ডনীয় হয়। এককালে এই ছবি ধর্মতলায় লুকিয়ে বিক্রি করা হত। সুতরাং, সংস্কৃতি এবং কু-সংস্কৃতি এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করতে হবে। এই কাজ দেশের প্রকৃত পণ্ডিতদের। আমি বললে কেউ শুনবে না, কারণ আমি কৌতুকাভিনেতা ভানু!

আলিবাবা নাটকে ভানু

নেতা কই? সব ভাঁওতাবাজ

লিখতে বসে প্রথমেই অনেকদিন আগের একটা কথা মনে এল। কে যেন লিখেছিল— 'বঙ্কিমচন্দ্রকে যখন দেখি নাই তখন তাহার মূর্তি কল্পনা করিতাম। যখন দেখি, তখন সে কল্পিত মূর্তি লজ্জার কোথায় লুকাইয়া গেল।' আমার অবস্থা তদ্রূপ। আমিও অনেক মূর্তি, অনেক ভাবনা নিজের মধ্যে কল্পনা করেছিলাম, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আমার কল্পিত ভাবনা, মূর্তিরা যে রূপ নিল তা না দেখলেই ভাল ছিল।

আমার নিজের সম্বন্ধে বলি না কেন। ছেলেবেলা থেকে অভিনয়ের চেয়ে রাজনীতির ওপর বেশি আগ্রহ ছিল। ১৯৩৫ সালে আমার বয়স তখন চোদ্দো। ঢাকাতে বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে তখন হইচই। কংগ্রেসে দাঁড়িয়েছেন হেমপ্রভা মজুমদার আর বিপক্ষে ঢাকা কামরুন্নেসা কলেজের অধ্যক্ষা সুজাতা রায়। আমি কংগ্রেসের সর্বকনিষ্ঠ কর্মী। হেমপ্রভাদি সেবার নির্বাচনে জয়ী হলেন। তখন কংগ্রেস ছিল একটা প্ল্যাটফর্ম, যেখানে নানা দল একসঙ্গে যুক্ত ছিল। আমি ছিলাম অনুশীলন দলের কর্মী। কিন্তু তখন আলাদা আলাদা দল থাকলেও তাদের মধ্যের দলাদলি এত ইতরামির পর্যায় নামেনি। সে যুগে যাঁদের সান্নিধ্যে এসেছি, তাঁদের মধ্যে মহাকরণের অলিন্দ যুদ্ধের বীর বিনয় বসু ও দীনেশ গুপ্তের নাম বড় বেশি করে মনে পড়ে। মজার কথা বিনয়দা ও দীনেশদা অনুশীলন দলের না হলেও আমরা সবাই প্রায় একই ছিলাম। তখন ক্ষুদ্র দলাদলির চেয়ে বড় ছিল দেশের স্বার্থ। তারপর ১৯৩৯ সালে দাদা মারা গেলেন। সংসারের ভার এসে পড়তে রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হলাম। কিন্তু সেই পুরনো পরিচিতদের সঙ্গে সম্পর্কে এতটুকুও ফাটল ধরল না। আমার একটা মস্ত বড় ভাগ্যই বলব যে, বহু লোকের সান্নিধ্যে যেমন এসেছি, তাঁদের অকুণ্ঠ স্নেহ পেয়েছি। তাঁদের সঙ্গে মিশে তাঁদের মনোবল দেখে, তাঁদের যুক্তিবাদী বক্তব্য শুনে নিজের মনকে যেভাবে তৈরি রেখেছিলাম, আজকের রাজনীতিওয়ালাদের দেখেশুনে মনে হয় আমায় কি তাঁরা ভুল শিক্ষা দিয়েছিলেন, না আমার বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে।

অভিসারিকা (১৯৭২) : ভানু ও রাজলক্ষ্মী

না, আমার বুদ্ধিভ্রংশ হয়নি। আজকের রাজনীতিওয়ালাদের রকমই এই। স্তম্ভিত হয়ে শুনি, যখনই কোনও নেতা বক্তৃতা দিতে ওঠেন, তখনই অন্য দল কী করেনি, দেশের কত ক্ষতি হয়েছে তার দলিল তুলে ধরেন, অথচ নিজেরা কী করছে সে সম্বন্ধে নীরব। সকালে যা বলেন, বিকেলেই ঠিক তার উল্টো বলেন, আর অতিশয় চতুর যাঁরা তাঁরা আবার অতীতের ভুল স্বীকার করে বাহাদুরি নিচ্ছেন। ১৯৪২ সালের নেতাজির সম্বন্ধে যখন দেশের শতকরা ৯৯ জন আশাবাদী, তখন যাঁরা তাঁর সম্বন্ধে বিষোদ্গার করেছেন, তাঁরা কেউ কেউ এখন 'থুড়ি' বলে সংশোধন করছেন, আবার কেউ বা সময় না পেয়ে ভো কাট্টা হয়ে গেছেন।

আমার বক্তব্য হল, দেশের আবালবৃদ্ধাবণিতাও যে ভুল করেনি, সে ভুল যে নেতা করেছেন তাঁকে নেতার স্থান দিতে জনগণের রাজি হইল ক্যামনে। বিয়াল্লিশে দেশ স্বাধীনের আগ্রহে বহু লোক এগিয়ে এসেছিলেন। আগস্ট বিপ্লবের অন্যতম আওয়াজ ছিল 'Do or die' কিন্তু মজা হল কি 'Do' তো কেউই টুঁ শব্দ করে বলেননি। না ছিল প্ল্যান, না প্রোগ্রাম। শুধু আওয়াজ গ্রাম, গ্রাম।

স্বাধীনতা হল। যে বাঙালিরা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে লড়লেন তাঁরাই আবার বঙ্গভঙ্গ করলেন। পূর্ববঙ্গ আর অপূর্ববঙ্গ।

স্বাধীনতার পর একই রাজনীতি চলছে—নির্বাচন হবে, নির্বাচিত প্রতিনিধিরা গদিতে যাবেন, আর সাধারণ মানুষ নদীতে ভাসবেন। যাঁর অতি চালাক তাঁরা কিন্তু পুরনো মদ নতুন বোতলে ভরে ভাঁওতা দিয়ে যান। এরপর 'নির্বাচন নয়' জিগির শুনলাম। যাঁরা জিগিরের হোতা, তারাই আবার নির্বাচনে নাচলেন।

বুঝুন এখন যা-ই কোথা।

আর এক মজার ব্যাপার দেখুন, যাঁরা বিধানসভায় কিংবা লোকসভায় যাচ্ছেন, তাঁরা সবাই চান 'সমাজতন্ত্র'— কি কমিউনিস্ট, কি ফরওয়ার্ড ব্লক, কংগ্রেস, জনতা সবাই-ই। তবে বিরোধী কীসে?

এ সব দেখে শুনে আমার মতো নগণ্য লোক এখন বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। আর আপনারা?

যে ছিল উত্তম

উত্তমের সম্পর্কে যখন বলতে বলেছে তখন বলেছি। লিখতে বললে বড় মুশকিল হয়, কারণ লেখক তো নই।

উত্তমের অভিনয় সম্বন্ধে কিছু লেখা আজ আর কোনও প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না, সেটা তার কাজের মধ্য দিয়েই সে প্রমাণ করে গেছে।

২। 'বলেছি' বলবে আসলে কথাটা হল বলেছি Sowhat কিন্তু Sowhat কথাটা উচ্চারণ করবে না, ওটা হল attitude এই 'বলেছি' কথাটা M.P. Studio-র মাঠে বসে সে প্রায় ৪৫ মিনিট ধরে আমার সঙ্গে বারবার বলে রপ্ত করে।

শুধু একটা কথা আমি না বলে পারছি না। উত্তমের অভিনয় ক্ষমতা আলোচনা করতে গিয়ে ও Comedy Acting-এ কী ভীষণ পাকা ছিল, সেটা কেউই বলেন না। আমার ওপর বিশ্বাস থাকলে এই সম্বন্ধে নিঃসন্দিহান হতে পারেন। তাঁর সঙ্গে অভিনয় করতে গিয়ে খুব কাছ থেকে একজন বড় অভিনেতা হওয়ার তাগিদে ছটফট করা মানুষ উত্তমের কথাই আজ লিখছি। এর আগে বহুল প্রচালিত নানা পত্রিকায় অনেকগুলিতে উত্তমের Tenacity-র সম্বন্ধে আমার এক বক্তব্যকে সাংবাদিকরা একটু উল্টোভাবে ছাপিয়েছেন। আসল ঘটনা 'বসু পরিবার' ছবিতে আমার dialogue, 'টাকাটা তো আপনি শোধ দেবেন বলেছিলেন?' উত্তমের dialogue বলেছি। পরিচালক নির্মল দে-র বক্তব্য ছিল, উত্তম।

অনেকে জিজ্ঞেস করেন, উত্তম কি পরনিন্দা পরচর্চা করতেন? সেই লোকেদের জ্ঞাতার্থে জানাই উত্তম একটাই জিনিস চর্চা করত, এবং সেই চর্চাটাই সব চেয়ে ভালবাসত, সেটা হল অভিনয়চর্চা। এবং সঙ্গে সঙ্গে অভিনয়ের আনুষঙ্গিক সব বিষয়ের রীতিমতো চর্চা। সে হিন্দি, উর্দু শিখেছিল বলার মতো। ইংরেজিও রীতিমতো শিখেছিল মাস্টার রেখেই। তার নিজের শরীর সম্পর্কে সে এতই সচেতন ছিল যে ১৯৬৯ সালে যখন তার বসন্ত হয় তার মুখও অসম্ভব গুটি বেরিয়েছিল। প্রত্যেকের জানা সে গুটির কী অসম্ভব যন্ত্রণা। উত্তম সহ্য শক্তির পরীক্ষায় পাস করেছিল, একবারও মুখের গুটিগুলোকে না চুলকিয়ে। তাই পরে তার মুখে একটিও দাগ ছিল

সখের চোরের শুটিংয়ে: ১৯৫৮

না। এই জাতের সহ্যশক্তি একমাত্র বিপ্লবীর মধ্যেই দেখেছি। অবাক লাগে যখন বেশ কিছু গুণিজনের মুখে উত্তমের সঙ্গে তাঁর পূর্বসূরিদের তুলনা করতে শুনি। আমার স্থির বিশ্বাস, সে আজ বেঁচে থেকে যদি একথা শুনত, সব চেয়ে বেশি আঘাত পেত। কারণ যে কোনও অভিনয়েতেই ওকে বলতে শুনেছি, এটা ওমুকের ওমুক বই থেকে নেওয়া, ওই জায়গাটা ওমুকের ওই বইটা থেকে নেওয়া। এটা তার সঙ্গে যারা কাজ করেছে তারাই জানে। অনেককেই বলেছে একটা বইয়ের বিশেষ একটা জায়গা ভানুদা বলে দিয়েছিল। তাহলেই দেখুন ও সমগোত্রীয়দের স্বীকার করত। সে জানত পূর্বসুরিদের শ্রদ্ধা করতে, জানত সমগোত্রীয়দের সঙ্গে সখ্য করতে। পূর্বসূরিদের উজাড় করা ভালবাসা, আশীর্বাদ সে পেয়েছিল তাই উত্তম— উত্তম।

এই রকমই বুঝি

১৯৮১ সালের আগস্ট মাসে আমি উত্তম ষাট। এর মধ্যে আমার অভিনয় জীবন কতটা অর্থাৎ আমার অভিনয় জীবনের শুরু কবে, কোথায় এটা বলতে গেলে প্রতিটি বাঙালির রেডিমেড উত্তরের মতো আমাকেও বলতে হয় 'স্কুল-কলেজে'। স্ত্রী চরিত্র বর্জিত 'মুকুট রায়' ইত্যাদির স্তর পেরিয়ে প্রথম যথার্থ অর্থে থিয়েটার করি যখন আমার বয়স আঠারো-উনিশ, আমি তখন ঢাকায় বি এ (কমার্সের) ছাত্র। 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের 'বাচালের' ভূমিকায় আমার সেদিনকার অভিনয় দেখে অধ্যাপক সত্যেন বোস, অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদার ও মোহিতলাল মজুমদার প্রমুখ আরও অনেকেই আমাকে অভিনন্দন ও আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন, তাঁদের সেই আশীর্বাদ যা আমি পরে সব সময় পেয়েছি, আমার অভিনয় জীবনের প্রত্যুষে এক বিশাল অনুপ্রেরণা।

২

অবশ্য আমি অভিনয় করতে আসি এক প্রতিজ্ঞা থেকে। তখন আমি ছোট, পাড়াতে স্টেজ বেঁধে অভিনয় হচ্ছে— মনে নেই কী বই। অভিনয়ের শিল্পীদের মধ্যে আমি নেই, তবুও স্টেজের পাশে দাঁড়িয়ে প্রস্তুতিপর্ব দেখছিলাম। মাথাটা আমার স্টেজ পর্যন্ত উঁচু, হঠাৎ কে একজন যে নাটকে অভিনয় করছে আমার মাথায় ধাঁই করে একটা লাথি কষিয়ে দিল। 'আমি এই লাথিটা ঠিক হজম করতে পারিনি।' সেই থেকে আমিও পণ করলাম আমাকেও স্টেজে নামতে হবে।

এর কিছুদিন পর পাড়াতে নাটকের মহলা চলছে। নাটকের নাম 'রণবীর'। খগেন চক্রবর্তী (খুব ভাল কণ্ঠশিল্পী) আর আমোদ দাশগুপ্ত (হকি প্লেয়ার, জামশেদপুর প্রবাসী) নাটকের রিহার্সাল দেওয়াচ্ছেন। আমি যথারীতি সেই নাটকের প্রতিদিনের মহড়ার একজন উৎসাহী ও মনোযোগী শ্রোতা। ওই নাটকে উদয় সিংহের ভূমিকায় যিনি রিহার্সাল করছিলেন তিনি কিছুতেই পরিচালকদের পছন্দমতো অভিনয়ের মাত্রায় পৌঁছতে পারছিলেন না। হঠাৎ একদিন তাঁর অনুপস্থিতিতে আমাকে উদয় সিংহের পার্ট বলতে বলা হল। আমি আমার এতদিনের রিহার্সালের উপস্থিতি ও মনোযোগ দিয়ে শোনা কাজে লাগিয়ে রিহার্সাল দিলাম। মহলার শেষে পরিচালকরা আমাকেই উদয় সিংহের ভূমিকায় অভিনয় করবার জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত করলেন। বুঝলাম,

রিহার্সাল দেখেও কত লাভ হয়। আমার এখনও মনে আছে কী প্রচণ্ড পরিশ্রম দিনরাত করেছিলাম ওই 'কে? মুখ যেন চিনি চিনি' এই সংলাপের সঙ্গে সঙ্গে কপাল চোখের ভুরুর সঙ্কোচনের জন্য।

৩

মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য আমার পরিবারের আত্মীয় ছিলেন। তাঁর আমেরিকা থেকে ফেরার পর আমাদের বাড়িতে আসার কথা আমার আজও মনে আছে। উনি আমার ভেতরে একটা উন্মাদনা এনে দিয়েছিলেন। অভিনয় যে একটা বিশেষ শিল্প ও এটা পরিশ্রম করে শিখতে হয় এই ধারণা তিনি ও শিশির ভাদুড়ি আমার মধ্যে দিয়েছিলেন। তখন কর্নওয়ালিশ থিয়েটারে (এখনকার শ্রী সিনেমা) শিশির ভাদুড়ির 'নাদির শা' নাটক চলছে। সেই নাটকে আমার নাট্যাচার্যের অভিনয় প্রথম দেখা। তার আগে তাঁর অভিনয় সম্বন্ধে আমার শুনে যে ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল নাটক দেখে আমার সেই ধারণা সম্পূর্ণ নতুন করে তৈরি হয়েছিল। আমার অভিনয়ের প্রতি আকর্ষণ আরও প্রবল হয়েছিল এই 'নাদির শা' দেখার পর। এই দেখা অর্থাৎ পূর্বসূরিদের অভিনয় অন্তঃকরণ দিয়ে দেখে, তার যথার্থ analysis করে, তাদের ভাল জিনিসগুলো বেছে নিয়ে নিজেকে শিক্ষিত করে তোলা আমার অভিনয় শিক্ষার একটা অঙ্গ। আমার অভিনীত নাটক ও ছায়াছবির অধিকাংশ চরিত্র সৃষ্টি করার আগে আমি আমার এই power of anlysisকে কাজে লাগাই। শিশির ভাদুড়ি, অহীন্দ্র চৌধুরি, ছবি বিশ্বাস, ভূমেন রায়, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসী লাহিড়ী, তুলসী চক্রবর্তী। এঁদের মধ্যে একমাত্র শিশির ভাদুড়ি ছাড়া বোধহয় প্রত্যেকের সঙ্গেই আমি অভিনয় করেছি। শিশির ভাদুড়ির সঙ্গে অভিনয় করা থেকে (তাঁর মৃত্যুর জন্য) বঞ্চিত হওয়া আমার জীবনের একটা বিশাল ক্ষোভ। প্রত্যেকের অভিনয় আমি মন দিয়ে দেখতাম ও তাঁদের অভিনয় ধারা অনুকরণ করার চেষ্টা করতাম। যেমন, একবার চারু অ্যাভিনিউ পাড়ায় 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে আমি চাণক্যের ভূমিকায় অভিনয় করি। সাহিত্যিক হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় 'চন্দ্রগুপ্ত' আর আমি 'চাণক্য'। অভিনয় করি সম্পূর্ণভাবে শিশির ভাদুড়ির অভিনয় রীতিতে, যদিও জানি শিশির ধারার আড়াই পার্সেন্টও আমি করতে পারিনি তবুও তাতেই বাহবা জুটে গেল। এইভাবে ছবিদার অভিনয় রীতি আমি বিশ্লেষণ করে দেখেছি যে তাঁর বাচনভঙ্গির যে বৈশিষ্ট্য সেটা একান্তভাবে ওঁর নিজস্ব, অপর কেউ ওইভাবে কথা বললে তা কৃত্রিম মনে হতে পারে। উনি সংলাপ কখনও একেবারে বলে যেতেন না— মাঝে মাঝে pause দিতেন। আমি বিশ্লেষণ করে ওঁর অভিনয়ের আঙ্গিক অনুকরণ করার চেষ্টা করেছি— কিন্তু বাচনভঙ্গি বাদ দিয়েছি।

'জাতি বিলাস' ছবিতে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৬২

অভিনয় করতে গিয়েই প্রথমেই আমি চরিত্রটিকে বিভিন্নভাবে দেখার চেষ্টা করি। অর্থাৎ, চরিত্রের মধ্যে involved না হয়ে, আমার সত্তাকে সচেতনভাবে দাবিয়ে রেখে, সেই চরিত্রের (আমার চিন্তানুসারে) আমার বৈশিষ্ট্যগুলো আনবার চেষ্টা করি। অর্থাৎ অভিনয়ের জন্য দরকার concentration and not total involvement। এছাড়া প্রতিদিন যত লোক দেখছি তাঁরা প্রত্যেকেই আমাকে সব সময় শিক্ষা দিচ্ছেন। কোনও চরিত্র করবার আগে আমি প্রতিদিনের দেখা অসংখ্য লোকের চেহারা চিন্তা করি— তাদের বাচনভঙ্গি আমাকে সাহায্য করে। নাটকের দর্শক আমার কাছে ভগবান। আমি কখনই তাদের ignore করি না। পর্দায় ও মঞ্চে একই চরিত্র করে আমি দেখেছি মঞ্চের চরিত্র-চিত্রণ আমাকে বেশি ও বিশেষভাবে আনন্দ দেয়। 'নতুন ইহুদি' বা 'জয় মা কালী বোর্ডিং'— এই দুটি মঞ্চ সফল নাটক তো চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে— দুটিতে আমার অভিনীত চরিত্র একই, কিন্তু নাটক দুটিতে অভিনয় করে আমি যে শিক্ষা লাভ করেছি, যে আনন্দ পেয়েছি, প্রতিদিন দর্শকবৃন্দের প্রতিক্রিয়া থেকে— সেই সুযোগ তো আর পর্দায় পাওয়া যায় না। নাটকে অভিনয় সৎ শিল্পীর কাছে continuous assesment-এর মতো। অবশ্য এটাও ঘটনা আজকাল সিনেমার পরিচালকরা একটা দৃশ্য তাদের পছন্দমতো করে তোলবার জন্য একাধিক 'শট' নেন। তবুও দর্শকের সঙ্গে যে সাবলীল ও স্বতঃস্ফূর্ত যোগাযোগ নাটকে তা তো আর আমি সিনেমায় পাই না— এইজন্যই সিনেমায় অভিনয় করার চাইতে নাটকে, মঞ্চে অভিনয় আমার কাছে চিত্তাকর্ষক। অনেক সময় দর্শকের মাঝখানে আমার বিশ্বস্ত কোনও সত্যিকারের নাট্য রসিককে বিশেষ কোনও প্রয়োজনে বসিয়ে রাখি। পরে নাটকের শেষে সেই রসিক ব্যক্তির সমালোচনা আমার অভিনয় ধারাকে পরিমার্জনা করতে সাহায্য করে, নিজেকে শিক্ষিত করতে সাহায্য করে। কারণ অভিনয় তো শিক্ষা করতে হয়। প্রচুর পরিশ্রম আর আন্তরিকতা না থাকলে এই শিক্ষা সম্ভব হয় না। আমরা যখন 'নতুন ইহুদি' করি ১৯৪৬ সালে তখন এই আন্তরিকতাই আমাদের মূলধন ছিল। যে আন্তরিকতার দৃষ্টান্ত 'নবান্ন' তখন রেখে গিয়েছে। দেশ বিভাগ আমার কাছে একটা প্রচণ্ড বেদনা। 'নতুন ইহুদি' এক অর্থে আমাদের বেদনার মূর্ত প্রকাশ। এর সঙ্গে ছিল আমাদের ভাল নাটক করবার বাসনা— যে নাটক অন্তত বাস্তবের সামনে মানুষকে নিয়ে আসবে, বিশ্লেষণধর্মী নাটকের 'ইস্যু' দর্শককে আনন্দের সঙ্গে চিন্তা করতেও শেখাবে। তাই ওই ছিন্নমূল মানুষগুলোর ছেড়ে আসা ভিটে, তাঁদের বিশাল জীবন আর বিপুল সামাজিক কর্মকাণ্ড— এই সত্যিকথাগুলো বলা আমার কাছে একটা বাস্তব প্রয়োজন বলে মনে হয়েছিল। কাজেই আমাদের রাসবিহারী মোড়ের প্রতিদিনের আড্ডায় যখন মনোজ ভট্টাচার্য এই বইয়ের কথা

'পথে হল দেখা' ছবির আউটডোরে শুটিং-এ সবিতা চট্টোপাধ্যায় (বসে) ও ভানু : ১৯৬৮

বললেন— তখনই আমরা রাজি হয়ে গেলাম। চেতলায় রিহার্সাল— সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সলিল সেন, শ্যাম লাহা, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশীল মজুমদার প্রমুখ আরও অনেকেই এসেছিলেন। এই নাটকের মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের বক্তব্য দর্শকের সামনে তুলে ধরতে পেরেছিলাম বলেই গ্রামেগঞ্জে, সর্বত্রই এই নাটক আমাদের করতে হয়েছে। আমরাও সানন্দে সেই সব জায়গায় আমাদের নাটক অভিনয় করেছি। শুধু কলকাতার মানুষের কাছে নয়— পশ্চিমবাংলার সব জায়গাতেই এই নাটক করবার জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম। অর্থাৎ প্রথম থেকেই আমরা আমাদের গণশিল্পীর আদর্শে গড়ে তুলতে সচেষ্ট ছিলাম— যা আমি এখনও আছি। কলকাতা শহরের ওই কয়েকটা হল-কেন্দ্রিক নাট্য আন্দোলনে আমার বিশ্বাস কম— ওই কটা জায়গায় 'কয় গণ যায়?'

আজকের গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন অনেকটা সেই রকম নাটকবিলাসীদের হাতে পড়েছে। সত্যিকারের প্রফেশনাল না হওয়া পর্যন্ত গ্রুপ থিয়েটারের ভেতরে এই অবস্থা থাকবে বলে আমার ধারণা। কিন্তু প্রফেশনাল হতে গেলে আন্তরিকতা ছাড়াও পরিশ্রম করে যাওয়ার মানসিকতা দরকার। অন্যান্য সমস্ত বৃত্তির জন্য যে ধরনের পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা আছে— অভিনয়ের ব্যাপারে আমার মনে হয় সে ধরনের ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল।

৫

কমার্শিয়াল বোর্ডের নাটক ও অভিনয় ধারার আলোচনায় তথাকথিত কোনও উচ্চগ্রামের কোনওপ্রকার অপ্রশংসা আমার নেই। বোর্ডের কমার্শিয়াল নাটকের নির্বাচনের পেছনে শুধুই যে অর্থকরী মনোভাব কাজ করে তা বোধহয় সবসময় যথার্থ নয়। ভাল নাটকের অভাবও এর একটা অন্যতম কারণ। যে দু-একটা ভাল নাটক লেখা হচ্ছে তা নাট্যকাররা তাদের নিজেদের গ্রুপের জন্য বগলদাবা করে নিয়ে যাচ্ছেন। ভাল নাটক মানে অবশ্যই drama of the soil. অধিকাংশ গ্রুপ থিয়েটার এখন নাটক সমস্যায় জর্জরিত— যেটা অনেকাংশে বোর্ডেরও সমস্যা। গণনাট্য, সবনাট্য পর্যায় শেষ করে কলকাতার নাট্য আন্দোলন এখন বিদেশি নাটক নিয়ে ব্যস্ত। ইতালিয়ান নাট্যকার, গ্রিক দেশীয় পরিচালক আর ভারতীয় অভিনেতাবৃন্দের মিলনে কলকাতার নাট্য আন্দোলনে মাঝে মাঝে অস্বাভাবিক ঢেউ আসে বৈকি! যদি বোর্ডকে ভাল নাটক না দেওয়া যায় তাহলে সত্যিকারের শিল্প সংস্কৃতি সুস্থ হয়ে উঠবে না। এর সঙ্গে সঙ্গে দরকার ভাল, সঠিক নাটক প্রচুর পরিমাণে লেখানোর আন্দোলন যাতে Public Board ও সেই নাটকের প্লাবনে ভেসে যায় অথবা নিজের প্রয়োজনেই

গুপি গাইন বাঘা বাইন (১৯৬৯) প্রথম দিনে সত্যজিৎ ও তাপু

সেই সুস্থ মানবিক মূল্যবোধের নাটক করতে বাধ্য হয়। সত্যিই বুদ্ধিদীপ্ত, মানবিক আবেদন পুষ্ট বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির নাটকের বড়ই অভাব আমাদের দেশে। ভাল নাটক পেলে আমরা করি ও করব। দর্শকও নাটক নেবে। এমন নাটক আমি করতে চাই না যা দর্শক বুঝতে পারবে না। অন্য কিছু নাট্যপরিচালক বা অভিনেতাদের মতো আমি বলতে চাই না যে আমার নাটক সাধারণের জন্য নয়। আশ্চর্য কথা, আমার দেশের দর্শকের ৯৯ ভাগ অতি সাধারণ। চার্লি চ্যাপলিনের ছবি দেখে বুঝতে তো কোনও সাধারণ দর্শকের বুদ্ধির অভাবে ভুগতে হয় না— তা হলে কি বুঝব চ্যাপলিনই অতি সাধারণ? আবার 'নতুন ইহুদি'-তে ফিরে যাই— কেন না উদয় সিংহের থেকে 'নতুন ইহুদি'র মধ্যে দিয়ে এসে আমি বর্তমানে একজন কৌতুক অভিনয় শিল্পী। আমার এই বিভিন্ন রূপে বিচরণ ও শেষে comic artiste-এ উত্তরণ— এটা আকস্মিক নয়— অথবা মোটেই ধারা বিরোধী নয়। এ অভিনয় করলেও আমি লক্ষ্য করতাম যে আমার বাচনভঙ্গি দর্শকদের ভাল লাগছে। এই বাচনভঙ্গির সঙ্গে আমার 'inborn wit' আর অসংশোধনীয় বাঙালত্ব যোগ হয়ে যে সমীকরণ সৃষ্টি হল তাই আজকের আমি। শুধু যে আমার বাঙাল ভাষাই আমাকে সাফল্য এনে দিয়েছে এটা আমি মানি না। 'পাশের বাড়ি' সিনেমাতে আমি বাঙাল ভাষা বলিনি— তবে খাঁটি বাঙালের যে বাঙালত্ব তা একেবারে চলে যায় না— সেইজন্য আমার সংলাপ বলার রীতিই আমাকে দর্শকদের প্রশংসা এনে দিয়েছে। অবশ্য এই সফল কৌতুক অভিনয়-শিল্পীতে রূপান্তর হওয়ার জন্য চলচ্চিত্রে অভিনয় আমাকে সাহায্য করেছে। মঞ্চে ও সিনেমায় একসঙ্গে অভিনয় করে আমি এই দুই মাধ্যমের ভাল দিকগুলোর সঙ্গে বেশ পরিচিত। মঞ্চে অভিনয় যেমন প্রতিদিন আমাকে দর্শকদের উষ্ণ অভিবাদনে আপ্লুত করে— তেমনি তাদের শীতল প্রতিক্রিয়া আমাকে ভাবায়, চিন্তিত করে। সিনেমায় সেই নতুন করে ভাবার সুযোগ নেই— তবে এটা তো ঠিকই পর্দার অভিনয়ের সাহায্যে আমি অনেক বেশি দর্শকের কাছে অনেক কম সময়ে পৌঁছতে পারি। তাই আমার মনে হয় আমার আজকের কৌতুক অভিনয় শিল্পীতে পরিণতির জন্য চলচ্চিত্র অনেকটা সাহায্য করেছে— অর্থাৎ আমাকে পরিচিত, জনপ্রিয় ও প্রতিষ্ঠিত করেছে। তবে চলচ্চিত্রে অভিনয়ের ভাল, মন্দ, পরিচালক ও অভিনেতা— এই দুজনের co-operation-এর ফল। নাটকে অভিনেতার স্বাধীনতা একটু বেশি। সিনেমায় পরিচালকের নির্দেশানুসারে আমাকে অভিনয় করতে হয়— প্রায় অনেকটা order supply-এর মতো। তবে এরই মধ্যে অনেক ভাল পরিচালকের সঙ্গে কাজ করে আমি খুশি। এখনও যখন হঠাৎ কোনও ছবিতে আমার serious role করতে বলা হয় আমি সানন্দে তা গ্রহণ করি। কারণ

সেটা গতানুগতিক অভিনয়ের ধারার একটা twist অথবা break—আমার মনের খোরাক। অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে যেমন আমি সত্যিকারের সৃষ্টির আনন্দ পাই, তেমনি এই কৌতুকাভিনয় আমাকে সামাজিক কর্তব্য করতে সাহায্য করে। আমার বিচারে সমাজে comedian-এর একটা বিশেষ অস্তিত্ব এবং কাজ আছে। কাজ মানে দায়িত্ব। সেইজন্য যাঁরা আমাকে শুধু অঙ্গভঙ্গি আর অর্থহীন বাচালতার সাহায্যে কৌতুক সৃষ্টি করতে বলেন তাঁদের প্রতি আমার সবিনয় নিবেদন যে 'আপনারা একটা fundamental mistake করছেন।' বীরবল, গোপাল ভাঁড় কি শুধুই অর্থহীন ভাঁড়ামো করে গেছেন? বীরবল মোগল দরবারের শ্রেষ্ঠ চেতনাসম্পন্ন চরিত্র। তাঁর কাজ ছিল সম্রাটকে প্রয়োজনানুসারে চেতনা সমৃদ্ধ করে তোলা। গোপাল ভাঁড় তো মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বিবেকের মতো শেক্সপিয়রের 'King lear'-এর fool চরিত্রের প্রয়োজন কি শুধুই গাধার টুপি পরে হল্লা? এঁরা প্রত্যেকেই তাঁদের রাজাদের চেতনা জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের মাধ্যম নিশ্চয়ই কৌতুক কিন্তু কখনই নিছক কৌতুক সৃষ্টি নয়। আমার দুর্ভাগ্য যে 'দেশে আসল রাজা নাই'— তাই কার চেতনা জাগাব? এখন রাজা ভেঙে দুভাগ হয়েছে। তবুও চেষ্টা করি ওই দ্বিতীয় রাজা অর্থাৎ শোষিত রাজার গণচেতনা আরও বেশি করে সমৃদ্ধ করে তুলতে অর্থাৎ আমি বেশ স্পষ্ট করেই বলতে চাই যে আমার নির্দেশনায় বা প্রযোজনায় আমি কখনই 'ভ্যাদ্‌ভেদে' নাটক করতে চাই না। সিনেমায় অনেক কিছুই দায়ে পড়ে করতে হয়। যদিও আমার প্রযোজিত 'যমালয়ে জীবন্ত মানুষ' ছবিতে আমি বহুদিন আগেই ভারতের জনসংখ্যা বিস্ফোরণ নিয়ে সরকারকে (আর্থিক সাহায্য ছাড়াই) অবহিত করেছিলাম। আবার, বর্তমান নাটকের শেষের দিকে আমি আবার এই সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছি কৌতুকের মধ্যে দিয়ে। 'শ্রীযুক্ত আলিবাবা' নাটকে আমি পাঁচশালা পরিকল্পনা রূপায়ণে ক্রমাগত ব্যর্থতার বিরুদ্ধে জনগণ আক্রোশের সংগঠিত রূপ দেখিয়েছি বৃদ্ধ মুস্তাফার হাতে ধনী আলিবাবার পতনের মধ্যে দিয়ে। বর্তমানের অনেক সমস্যা আমাদের সামাজিক অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তোলে তার প্রতিকার করা হয়ত আমার সাধ্য নয় তবে সেই সমস্যার প্রকৃত চেহারা ও সমাধানের ইঙ্গিতবাহী কোনও (কৌতুক) নাটক করতে আমি সব সময়ই আগ্রহী। আবার যদি কোনও 'নতুন ইহুদি' নতুনভাবে করতে হয় তাহলে আমি প্রস্তুত।

৬

এখন, আমাকে যদি কমিটেড শিল্পী বলা হয় তাহলে আমার কোনও আপত্তি থাকবার কথা নয়, কেবল একটি ছাড়া। নাটকের মধ্যে দিয়ে আমি মানুষের পক্ষে

কথা বলতে চাই সেটা রাজনৈতিক হতেই পারে। তবে আমি কোনও পার্টির রাজনৈতিক বক্তব্য আমার নাটকের মধ্যে বলতে চাই না। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে ও দৃষ্টিভঙ্গিতে যা কিছু সমাজের ও সাধারণ মানুষের স্বার্থের পরিপন্থী আমি দরকারমতো ও সাধ্যমতো তার বিরুদ্ধে মানুষকে খোঁচা দিয়ে জাগাবার জন্য নাটক করে যেতে চাই তা সে ব্যঙ্গ বা সিরিয়াস যা কিছু হোক না কেন এটাই আমার কমিটমেন্টের শেষ কথা। একেবারে শুরুতে 'নতুন ইহুদি' বর্তমানে 'জয় মাকালী বোর্ডিং' আর মাঝে 'যমালয়ে জীবন্ত মানুষ' — আমার শিল্পী মানসের গতি ও প্রকৃতি আলোচনা করবার ও বুঝবার পক্ষে, আমার মনে হয় — এই ত্রিধারা প্রয়োজনীয় সাহায্য দিতে পারে। কারণ আমি আগেই বলেছি আমার অভিনয় জীবনের বিকাশের মধ্যে কোনও আকস্মিকতা নেই বরং একটা স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিকতা আছে।

অভিনেতা হিসেবে আমার কোনও ক্ষোভ নেই— বললে সবটা হয়ত বলা হল না। আমি দারুণ, 'ভয়াবহভাবে' সংসারী ও খুশি অভিনেতা। তবে এই সুখের মাঝে একটা কাঁটা আছে— আমি এখনও ভাল রোলের সন্ধানে ব্যস্ত। সত্যিকারের ভাল চরিত্র আমাকে এখনও আকর্ষণ করে। আর সেইটাই আমি কম পাই। আমার সম্বন্ধে একটা কথা চালু আছে শুনেছি যে আমি নাকি কিঞ্চিৎ dull brain-এর অধিকারী। হতে পারি তা। আর তাই হয়ত এখনও roleটাই খুঁজি অভিনয়ের জন্য, ভাঁড় হতে রাজি হই না। অবশ্য এই 'ভাঁড়' কথাটার উৎসটা মনে হয় জানা নেই অনেকেরই। আর তাই 'গোপালভাঁড়'-এর রসালো কথাবার্তা থেকে ধরে নেওয়া হয়েছে যে ভাঁড় মানেই একটা রঙ্গ তামাশা এবং একটু আদিরসাত্মক ব্যাপার-স্যাপার মিলিয়ে একটা পদার্থ! আসলে মনে হয় ভাঁড় হল পরামানিকের আর এক নাম। পুরাকালের। আগেকার দিনে পরামানিকের বাক্স ছিল না। তারা ভাঁড়ে করে ক্ষৌরকার্যের মালপত্র নিয়ে বাবুদের বাড়ি কামাতে আসতেন। তার উপস্থিতিটা জানানো হত 'ভাঁড়' ব্যাপারটা যা প্রায় গোপালের পদবির মতো হয়ে গিয়েছে সেটা ওই পেশাকেন্দ্রিক। আজকের দিনের আলুওয়ালা, পাল্কিওয়ালা গোছের। আমি খাঁটি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নিজের কামানো ছাড়া কখনই কারও কামিয়ে দিইনি, তাই কোনও অর্থেই আমি ভাঁড় নই বা হতেও চাই না।

৭

হতে পারি আমি dull brain, তাই গৌরী সেনের টাকায় (সরকারি) ছবি করার চেষ্টা আমি করিনি যদিও ছবির অভিজ্ঞতা আমার আছে। নাটক বা যাত্রার জন্যও

অনুদান চাইনি এখনও কারণ হয়ত ওই dull brain। সেদিন এক বিরলকেশ ব্যক্তি এসেছিলেন আমার interview নিতে, বললাম কিছু কথা। তাঁর সঙ্গিনী ছিল এক তরল প্রকৃতির তরুণী। তাঁর কিছু অবাঞ্ছিত কথার মাথামুণ্ডুও বুঝলাম না। সে-ও হয়ত dull brain বলেই। তবে মোদ্দা কথা হল, এই সব মিলিয়েই আমি। এখনও অন্য কারও ভাল অভিনয় দেখলে জড়িয়ে ধরি তাকে, তাকে কাছে পেতে সাধ যায়, শিখতে ইচ্ছে করে তার কাছ থেকে। মনে হয় কত কী করা হয়ে উঠল না, আর কত কীই যে করবার আছে!!! আর এইসব ভাবনা মাথায় এলেই কাঁটার খোঁচা খেয়ে বলে ফেলি— 'একটা ভাল role চাই।' বদলে এসে হাজির হয় একঘেয়ে কিছু কাজ, সেই একই ধরন, একই রঙ, একই ভঙ্গি। কত আর ভাগাব! তাই কিছু কিছু করতেও যাই আর পুরনো make-up টা নতুন করে মুখে মেখে স্বগতোক্তি করি আয়নাটার সামনে। উল্টোদিকের ছবি জিজ্ঞাসা করে 'পেলে?' আমি বলি 'না, I am still after a role'।

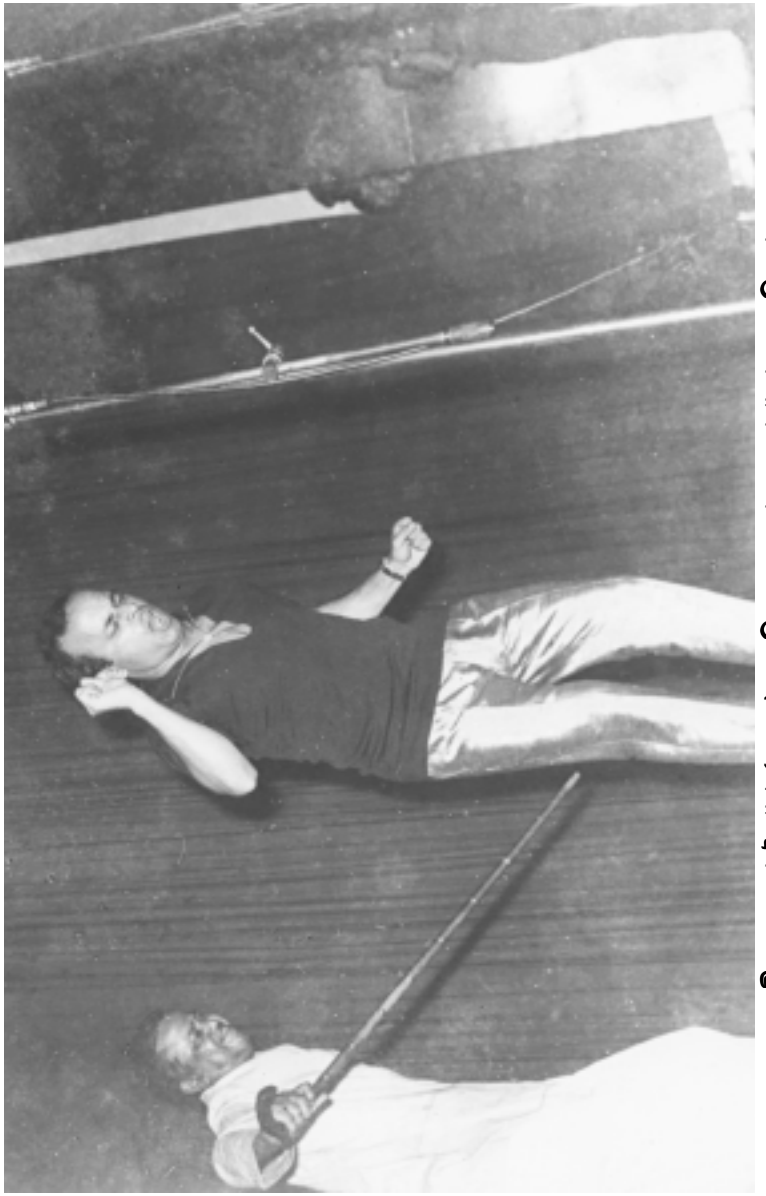

বসুশ্রী হলে ১লা বৈশাখ (১৯৭০) : কমিক স্কেচ, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও রবি ঘোষ।